

চেতনা একটি ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা

- অবহেলা যতদিন, সংরক্ষণ ততদিন
- শ্রেণী সংগ্রাম-শ্রেণী ঐক্য বজায় রেখে এস.সি., এস.টি., ও.বি.সি., সংখ্যাগুরু, মহিলাদের অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলুন
- সাম্রাজ্যবাদ, ব্রাহ্মণবাদের কবল থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করুন
- উন্নয়নের বাহনায় অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধ হোক
- বিদেশী পুঁজি বাজোয়াগু করে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটান

DAFODWAM thinks that India is a de facto upper caste Hindu state and Brahminism derived from MANU SANGHITA is still the guiding philosophy of the Indian ruling classes. Until the abolition of the caste system and discrimination based on gender and community there is no chance of the victory of class struggle, in whatever form.

Besides taking programmes of rights of Dalits, Women and Minorities (Religious and Linguistics) DAFODWAM is in the area of publication of books on concerned subjects in different languages.

For Correspondence :

ananta acharya
DAFODWAM
30/2 N.P. Road, Kolkata - 700055,
West Bengal, India
Ph: (0)9331858854

Email- dafodwam@gmail.com
anantaacharya1949@gmail.com
mukta_angan2002@rediffmail.com

Exchange Price - 25/-

Edited and Published by ananta acharya on behalf of DAFODWAM,
30/2 N.P. Rd. Kolkata - 700055 and Printed at Saikhur Muzam - 4 D.P.S. Rd. Kolkata - 700033



চেতনা

সম্পাদকীয়

ব্রাহ্মণ্যবাদের সদর দপ্তরে কামান দাগো

ডাকোডাম (ডেমোক্রেটিক আকশন ফোরাম অফ দলিতস, ওমেন এ্যান্ড মাইনরিটিস) এর বাংলা ভাষায় মুখপত্র চেতনা লহর প্রকাশিত হোল। নামেই ডাকোডামের পরিচয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে মনুবাদ প্রভাবিত রাষ্ট্রে দলিত, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পাশে থাকবে চেতনা লহর। পত্রিকার প্রচ্ছদে যে কজন শিক্ষকদের ছিন্ন চিত্র (জন্মসাল অনুসারে সাজানো) দৃষ্ট হচ্ছে তাঁরা, চেতনা লহরের মতে, ভারতীয় জনগণের সার্বিক শোষণ মুক্তির সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জাতিভেদ ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা, লিংগ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ের সাফল্যও অর্জন করতে পারিনি, তা আমাদের লজ্জা। সারা দুনিয়ার অন্যপ্রান্তের তুলনায় ভিন্ন ধরনের ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে এবং তার স্তরে স্তরে কুৎসিত বিভাজন এবং বঞ্চনার উৎসবলীকে চিহ্নিত না করতে পারলে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাও মুখ্যমী। সমাজ পরিবর্তনে নিবেদিত মার্কসবাদী ঘরানার কর্মীদের কাছে আমাদের আবেদন যে, ভারতীয় সমাজের সামান্য রং পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডেও আগ্রহীদের আশ্রয়দর, পেরিয়ার, জ্যোতি বা ফুলে এবং বেগম রোকেয়ার রচনাবলী পাঠ করা প্রয়োজন। একই সাথে একথাও বলা দরকার যে আশ্রয়দর, পেরিয়ার, ফুলে এবং রোকেয়ার অনুগামীদের সারা দুনিয়ার মানব মুক্তির দর্শনের বক্তব্যাদী পথ প্রদর্শক কার্ল মার্কসকেও প্রাপ্য গুরুত্ব দিতে হবে। মনুসংহিতা হতে নির্গত ব্রাহ্মণ্যবাদ আজ ভারতের শোষণ- শাসক শ্রেণীর শক্তিশালী হাতিয়ার। চেতনা লহরের ঘিষাইন ঘোষণা যে ভারতীয় সমাজের স্তরে স্তরে মনুবাদী কর্তৃত্বের অবদান না ঘটলে প্রাথমিক স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এমতাবস্থা অটুট রেখে আমূল সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখা গঠন করাও সম্ভব নয়। বর্ণহিন্দু রাষ্ট্রের সমস্ত ধরনের

স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘরানার চিন্তকদের সমন্বয় মঞ্চ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা পূর্বে প্রকাশিত করেছি মূল্যবান রচনা পুনরায় পাঠের ভাগিদে প্রকাশ করলাম। এটা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে জাতিভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে শ্রেণী সংগ্রামের কোন বৈরিতা নেই বরং তা পরস্পরের পরিপূরক কিন্তু সমান্তরাল নহে। চেতনা লহর আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন অবস্থান অবচ সবহারী মানুষের সাথীদের ভাবনা বিনিময়ের মঞ্চ গঠনের সমস্ত প্রক্রিয়ার সাথী হবে। ব্রাহ্মণ্যবাদের সদর দপ্তরে কামান দাগার জন্য এক ব্যাপক যুদ্ধমোচির প্রয়োজন। আসুন আমরা স্বপ্ন দেখি, দেখাই এবং স্বপ্নপূরণের প্রয়াসে সামিল হই যে এক নতুন ভারত জন্ম নেবে যেখানে শ্রেণী শোষণের সাথে সাথে জাতিগত বঞ্চনা, সম্প্রদায়গত হিংসা, নারী দমনের কোনও রকমের চিহ্ন থাকবে না।

মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি, সেদিন সুদূর নয় আর ...

কৃতজ্ঞতা : মোনালিসা (মুদ্রণ পরিকল্পনা), বাবলা (প্রচ্ছদ),

গুণপ্রতিম (সার্বিক পরিকল্পনা), বুলবুল আহমেদ (উপদেষ্টা)

শূদ্র না ব্রাহ্মণ ?

শিবরাম চক্রবর্তী

সমস্ত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করা হোক, এই মর্মের একটা প্রস্তাব সম্প্রতি হয়েছে।

এই প্রস্তাবে আমার আপত্তি। পৃথিবীর কোথাও একদল মানুষ আছে যারা নরখাদক, সেই কারণে পৃথিবীর সব মানুষকে নরখাদক বলে ঘোষণা করা হোক - এই মতে আমি কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। বরং আমার মতে, সম্ভব হলে, নরখাদকদেরই মানুষ করার পক্ষে চেষ্টা হওয়া উচিত।

'ইংরেজ' - এই শব্দটি করলে পৃথিবীর আজ যে কোন প্রান্তে যে কেহ সম্বন্ধার লোক বুঝতে পারে যে, এই নামেই যে জাতি, তারা বর্বরতার একটা সভ্যরূপ রূপ দিতে পেরেছে, অত্যাচারকে শাস্তি ও শৃঙ্খলার নামে ঢালাতে পেরেছে এবং শোষণের ফলে শোষিতের মনে অবিমিশ্র আনন্দ দান করতে পেরেছে - এইরূপ অসম্বারণ প্রয়োগনিপুণ্য আছে বলেই পৃথিবীর তারা অস্টম আশ্চর্য। বর্তমান যুগে ইংরেজ যা সম্ভব করেছে, সেই বস্তু অতি প্রাচীন যুগেই আমাদের ব্রাহ্মণেরা সমাধা করেছিলেন। এজন্যে তাঁরাও কিছু কম যান না - পৃথিবীর আদিম আশ্চর্য তাঁরা।

শোষণের জন্যই শাসন - এই সনাতন মূলনীতির মূলধার ব্রাহ্মণ। শোষণকে প্রচ্ছন্ন করতে হলে শাসনকে একটা আদর্শের নামে খাড়া করতে হয়, অতীতকালের ব্রাহ্মণরা ডিমোক্রাসির এই গুণ - তত্ত্ব ভাল করেই জানতেন। ভারত যে একদা সভ্য ছিল অর্থাৎ বর্বরতাকেও লজ্জা দিতে পেরেছে - সেকালের বামুনেরাই তার প্রমাণ।

'ও' - এই একাদশ বর্ণকে অনুমানিক সুরে উচ্চারণ করলে যে প্লুতকরের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটলে শূদ্রের বিষম দশা। তা যদি শূদ্রের কণ্ঠ থেকে

বেরোয়, তাহলে তার জিভ কেটে ফেলতে হবে এবং যদি কানের ভেতরে ঢোকে তাহলে তার কর্ণকুহরে সীসে গলিয়ে ঢালার সুব্যবস্থা। বামুনদের সভ্যজানোচিত শাসন-নীতির এমন বহুতর দৃষ্টান্ত মনুসংহিতার পাতায় পাতায়। জলদস্যুদের যে সব বংশধর আধুনিককালে সভ্য হয়ে উঠেছে, শাসন - নীতির দিক দিয়ে, 'দেববংশসম্ভূত' পৌরাণিক ব্রাহ্মণদের এখনো তারা লজ্জা দিতে পারেনি।

শোষণ-নীতির দিক দিয়েই পেরেছে কি?

আমি বলি, আজ্ঞে না।

ইংরেজরা রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিকে জড়ীভূত করবার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু প্রায়ই তার জোড় ভাঙে - তখন বিখ্যাত দুই নীতির আপনা-আপনি মধ্যে ঠোকাঠুকি বেধে যায়। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ ধর্মনীতির সঙ্গে অর্থনীতির যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন, তা আজো অক্ষুণ্ণ রয়েছে - তাঁরা সেই প্রাচীন যুগে যে শোষণ যন্ত্রের স্থাপনা করে গেছেন, তার যন্ত্রণাহীন চক্রান্তে নিষ্পিষ্ট হতে আজও আপনা থেকেই লোক এগিয়ে আসে। সত্যি, দিব্যদর্শন ছিল বইকি তাঁদের। কেননা, এই মানুষ-পেথা-কল চালিয়ে তাঁদের বংশধরেরা যে চিরকাল ধরে করে থাকে, এটা তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের দূরদৃষ্টির বলেই এই সেদিন বামুনরা নিজাদের দূরদৃষ্টিকে চৈকিয়ে এসেছে।

প্রত্যেক ও পরোক্ষ ট্যাকসো আদায়ের যে 'শিডিউল' তাঁরা সেকালে বেঁধে গেছেন, একালে এমন কোন অর্থনৈতিক মাথাই নেই যে তার সমান একটা কিছু বানাতে পারে। ব্যাংক মাসে তেরো পার্বণ, নিত্য নৈমিত্তিক পূজাচন্দা, শাস্তিহুজায়ন, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ - এসব তো লেগেই রয়েছে বরাবরের ব্যাপার। কিন্তু এসব উপলক্ষে পৌরোহিত্য করবে কে? - বামুন। দান করব কাকে? - বামুনকে। দানের বৈচিত্র্যই বা কত রকমের। সোনা রূপো হাতী ঘোড়া কাপড় চোপড় বাসন কোশন থেকে শুরু করে কাহন কাহন কড়ি পর্যন্ত - যার যেমন সাথ - যথাসাধ্য।

৫৩৯

শুধু কি দান? তার সঙ্গে গণ্ডেপিণ্ডে ভোজন। নেহাৎ কম হলেও অন্তত 'দোয়া-দশটিকেও' তো খাওয়াতে হবে? এবং ভোজনের সঙ্গে দক্ষিণাটাও নগদ। অথচ দাতার পুলক ধরে না। অপাত্রে এই নির্বিচার দানের কোন যুক্তি হয় না, কিন্তু দাতার মনে কোনই প্রশ্ন নেই। এই কায়-মনোবাক্য দানের ফলে অক্ষয় স্বর্গবাস কায়ম হচ্ছে। শোষণের ফলে শোষণের সৃষ্টি করার অদ্ভুত এই প্রতিভা, আমি শুধু ভাবি, সে যুগে এ সম্ভব হল কি করে? এ যুগের ট্যাকসো আদায়ের একশো রকম কারদার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অবাক হতে হয় - কানুনের হেরফের থাকলেও কারদার এরা এতই অনুকূল যে, মৌলিকতার দিক দিয়ে রূপের মিল অণুমাত্র হলেও লৌকিকতায় এরা সমগোত্র। ইতিহাসের মতো, সভ্যতাও কি খোল-নোলচে বদলে বদলে আসে নাকি?

এবার আরো বিস্ময় এই যে, আওরঙ্গজেবের বহুপূর্বে জন্মগ্রহণ করেও মানুষের ওপর ট্যাকসো আদায়ের যে বিধি-নিষেধ তাঁরা বের করেছিলেন তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অপূর্ব; এমন কি এ বিষয়ে পরবর্তী আওরঙ্গজেবকেও তাঁরা টেকা মেরে গেছেন। মনে করুন, কোন ভাগ্যবান ভারতভূমিতে জন্মালেন। ছ'দিনের দিন তাঁর যেটোরা পুজো, ছ'মাসে অন্নপ্রাশন, ছ'বছরে উপনয়ন, তারপর বিয়ে, তারপরে তাঁর বংশবৃদ্ধি এবং সর্বশেষে তাঁর শ্রাদ্ধ! - এর সব উপলক্ষেই বামুনদের ট্যাকসো দিতে হবে। এমনকি, মরেও শাজনা এড়িয়ে ফাঁকি দেবার যো নেই। অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ যে একলা জন্মেছিলেন, তার জন্যে অতি আধুনিক প্রপৌত্রকে প্রতি বছরে ট্যাকসো দিতে হয়। শ্রাদ্ধ গড়ায় অনেক দূর।

বণিকবৃত্তি বা ব্যবসা-বুদ্ধিতেই কি তাঁরা কম ছিলেন? এমন অপবাদ তাঁদের কোন শত্রু, এমনকি আমিও দিতে পারব না। বিনা পুজিতে লিমিটেড বা আনলিমিটেড কোম্পানি গড়ে যে সব কারবার অতি পুরাকালে তাঁরা ফেঁদে গেছেন, আজ অদি তার একটাও দেউলে হয়নি, বরং লভ্যাংশে বেড়েই চলেছে দিন দিন। এই গুরুগিরির ব্যবসাটাই কি কম ফলাও? কিঞ্চিৎ শব্দরন্ধোর বিনিময়ে বংশানুক্রমে কান মলে কাকুনমূল্য আদায়। বিনা ট্রেডমার্কেই এই ব্যবসার ব্যবসা চলে। তীর্থ, মঠ, গুরু আর মোহন্ত - এদের উপায়ের কাছে ফোর্ড-রকফেলার

৫৩৯

সাহসের আরও কিছু না।

• সভ্যতার দুটো দিক, এক দিকে তার উন্নতি আর এক দিকে তার উদ্ভৃতি। এক দিকে সে বর্ধর - নিজে বাঁচবার জন্য অপরকে মারতে তৈরি সে; বিধাতার দেওয়া দুটো হাত আলিঙ্গন করার পক্ষেই যথেষ্ট, অপরকে শাসন ও শোষণ করার জন্য তাই সে এখানে আরো ছ'টা হাত সৃষ্টি করে সেজেছে অষ্টোপাশ, এখানে তার কুঁচ চাল ও নখদস্ত চালনা কখনো প্রকাশ্য কখনো প্রচ্ছন্ন। ইউরোপীয় সভ্যতার এই দিকে আছে বার্কেনহেড, ডায়ার - এদের মতো লোকেরা।

কিন্তু সভ্যতার আরেকটা দিক আছে যেখানে তার উদ্ভৃতি যেখানে তার ঐশ্বর্য, যেখানে সে অপরকে দিতে উন্মুখ, সেখানে সে অপরকে বাঁচালে ভাবে আমি বাঁচলুম, যেখানে অপরে অসম্পূর্ণ থাকলে তার নিজের পূর্ণতা নিরর্থক মনে হয়; যেখানে সে বলে, যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিম কুর্যাম। ইউরোপীয় সভ্যতার এদিকটায় আছেন ইউরোপের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী-কবি-মনীষীরা। সভ্যতার এই অংশটাই অপরাধকে অসম্পূর্ণতার লজ্জা ও অগৌরব থেকে মোচন করে, তার ভারকেন্দ্র স্থির রাখে, সভ্যতাকে যাতে সভ্যতা বলেই সন্দেহ হয় - এমন বিব্রম রচনার চেষ্টা করে।

কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাচীন সভ্যতার আমরা কেবল প্রথম গোত্রেরই পরিচয় পাই - যেখানে সে আত্মপ্রসাদের জন্য দুহাত বাড়িয়ে কেবলি নিয়েছে; কিন্তু সেই আত্মপ্রসাদের জন্য যেখানে দু'হাতে দিতে হয়, সভ্যতার সেই ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের দেখি অতি কম। একেবারেই যে দেখিনে তা নয়, কেননা বামুনদের মাথাও কখনো মানুষ জন্মাতে পারে।

এই জন্য ব্রাহ্মণ সভ্যতার এক দিকে যেমন মনু, পরাশর, পরশুরাম প্রভৃতিকে দেখিতে পাই - যারা দোর্দণ্ড প্রতাপে দোহন করেছে, শাসন করেছে, নিকিঁচারে হত্যা করেছে ও চরণস্ত করেছে; তেমনি অপরদিকে বাণীকি ও বেদব্যাসের মতো অপরাধের বঁস্টার সম্ভান পাইনে। এইজন্য সভ্যতার যে একাংশে বামুনের একচ্ছত্র, সেখানে তারা যা রেকর্ড রেখে গেছে, এ অবধি বহু

বহু সভ্যজাতি প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই রেকর্ডের কাছাকাছি ও দাঁখতে পারেনি। ব্রাহ্মণ পরশুরামের সঙ্গে স্লেচ্ছ ডায়ারের তো তুলনাই চলে না, হত্যানৈপুণ্যে পরশুরামের কড়ে আঙুলের যোগাতাও ডায়ারের নেই।

ব্রাহ্মণ-সভ্যতাই যদি ভারতীয় সভ্যতার শেষ কথা হত, তাহলে তেমন দুর্দিন পৃথিবীর আর কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য এড়িয়ে উঠতে না পারলেও তার সভ্যতাকে পেরিয়ে যা উঠেছিল, তাই হচ্ছে হিন্দু সভ্যতা - এই সভ্যতারই দিগ্‌ ব্যাপ্ত কিরণের মাঝে ব্রাহ্মণের কলঙ্কও অনেকটা শোভার মতোই দেখাচ্ছে। এই সভ্যতা আসলে ব্রাহ্মণের জাতির সৃষ্টি।

ব্রাহ্মণ-সভ্যতার দুটি পুঞ্জ, মনুর গতকল আর পরশুরামের পরশু; পেনাল কোড আর রেগুলেশন লাঠি। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার মাঝেই আমরা পাই ভারতের দর্শন, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য - তার ঐশ্বর্যের সহস্রমুখী উৎসার। তার মাঝেই আমরা পাই, দস্যু বাণীকির রামায়ণ, গ্লোলেমীর ছেলে বেদব্যাসের মহাভারত। যে উপনিষদের গর্বে আমরা মশগুল, তারও বেশিরভাগ ক্ষত্রিয়ের রচনা। আয়ুর্বেদ, রসায়ন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও ব্রাহ্মণেরই প্রতিভা।

এই হিন্দু সভ্যতায় ব্রাহ্মণের দান অতি সামান্যই। বলতে গেলে ব্রাহ্মণের থেকে যতটা এ নিয়েছে - বর্ণ বিচার, স্পর্শদোষ আর 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি' - তাই এর কলঙ্ক। ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রভাবিত না হলে এ সভ্যতা আরো প্রাণবান, আরো বেগবান, আরো বীর্যবান হতে পারত - বিজয়বিজয় করত এ সভ্যতা। ভারতীয় এই সভ্যতায় অনার্যের দান আছে, মুসলমানের দান আছে। এর বঁস্টারের মাঝে এক কালে ক্ষত্রিয় বৈশ্য হরত ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব নেই, বিপুল শূদ্রশক্তি আত্মসাৎ করেছে তাঁদের। শূদ্রের দ্বারাই এই সভ্যতার সৃষ্টি ও পুষ্টি, এজন্য আমি একে কলব শূদ্র সভ্যতা এবং এইজন্যই এ বিরাট, এই এর মহাভাষ্য - ব্রাহ্মণ সভ্যতার চেয়ে ঢের ঢের বড় - এই হিন্দু সভ্যতা। ব্রাহ্মণ না জন্মালেও এ হত এবং ব্রাহ্মণ লোপ পেলেও এ থাকবে। বরং বামুনের

প্রাণ্য লোপ পেলে এই সভ্যতার প্রাণশক্তি পূর্ণ মুক্তি পাবে; বৌদ্ধযুগে যেমন হয়েছিল তেমনি ভারতের অন্ধনিহিত ঐশ্বর্য আবার সহজদলে আত্মপ্রকাশ করবে।

কিন্তু সমাজে ব্রাহ্মণের প্রভাব কী উপায়ে ঘোচানো যায় তাই আজকের সমস্যা। আজকের সমাজের ওপর আজকের বামুনদের, বামুন বলে কোন প্রভাব আছে, এ আমি মনে করিনে। যে ব্রাহ্মণ এখনো এর কাঁধে বসে কষ্টরোধ করে রয়েছে তা অতীতের কঙ্কালমূর্তি - তার কল কবল থেকে মুক্ত করা মানে একে অতীতের কবল থেকে বিমুক্ত করা। এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর যে উপায়ই থাক, সমস্ত হিন্দুকে বামুন বলে ঘোষণা করা সে উপায় নয়। কেননা, প্রথমত, তাতে সন্ত্রস্ত হিন্দুর তথা মানুষের মানহানি; দ্বিতীয়ত, যে বস্তুর বিলোপ বাঞ্ছনীয় এবং যা মস্তিষ্কে বাসেছে, তাকেই শুধু মর্বাদা দেওয়া নয়, আবার জীইয়ে তোলা।

তাই, ঘোষণা যদি করতেই হয়, অরাক্ষণ নির্বিশেষে সবাইকে শূদ্র বলে ঘোষণা করছি ভাল, কেননা শূদ্র বামুনের চেয়ে মহত্তর জাত। 'মহত্তর' বললাম বলে কেউ যেন না মনে করেন যে, বামুনদের জাতি হিসেবে, অর্থাৎ, আমি মহৎ বলে মনে করি। কিন্তু মহৎ বলে মানি আর নাই মানি, নিপুণ বলে তাঁদের আমি মানবো। যে অশ্বমেধের খোঁড়া দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল, তার মুখে লাগাম লাগিয়ে তাকে ময়লা টানা গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে মহত্ত্ব না থাক, নৈপুণ্য যথেষ্টই। যে শূদ্র ভারত একলা বৌদ্ধযুগে আপন আত্মার পূর্ণ প্রকাশকে ধরে রাখতে না পেরে, নিজের কুল ছাপিয়ে, আর্যের পৃথিবীর সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিল, তাকেই আবার অন্ধকূলের মধ্যে টেনে কোণঠাসা করে আনা এবং কেবল ইচ্ছামাত্র তার গতিরোধ নয়, ইচ্ছামতো তাকে দিয়ে ব্রাহ্মণের সমস্ত ময়লা টানানো সামান্য বাহাদুরি নয়। মুষ্টিমেয় ইংরেজ যে কৌশলে ব্রিটিশ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করে, মুষ্টিমেয় বামুনের কেরামতি তার চেয়ে একটুও কম নয়। ইংরেজের সম্মুখে আছে সঙ্গী বন্দুক, কিন্তু বামুনের মুখে শুধু সংকুত শ্লোক, - অশুদ্ধ হলেও কিছু যায় আসে না, নিছক কিসর্গের বুলেট দিয়ে যে সাম্রাজ্য আদিভূগ থেকে এ পর্যন্ত সে রক্ষা করেছে, ভূগোলের মধ্যে তারা

বিস্তার দেখা না গেলেও ভুলোবের দীর্ঘতম কালের ইতিহাসকে তা আচ্ছন্ন করে রইল। মানুষের দুর্গতির এতদূর গতি আর হয় না।

এই জনাই মনে হয় যে, ভারতের ইতিহাসের গতি বদলাতে হলে আগে বামুনের একটা বিধি করা দরকার। অমৃতসরে ডায়ার ভারতের লোককে কী করে বুকে হাঁটাতে পারল, তাবতে গিয়ে আমরা চমৎকৃত হই। সন্ন্যাসকেই বুকে হাঁটান যায়, মানুষকে না। যুগ যুগান্ত ধরে যে জাতি স্ত্রীওচ্ছ দেখলেই বুক দিয়ে মাটি আশ্রয় করেছে, সঙ্গী দেখলে সে যে আরো অনার্যাসে তাই করবে এ তো আশ্চর্য কিছু নয়। কেননা, সঙ্গী ব্রহ্মশাপের চেয়েও সঙ্গী এবং তার গর্ভে সূতোর চেয়ে একটু শক্তই। বামুনকে কাঁধ থেকে নামাতে না পারলে এ জাত কোন দিনই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মনুর সত্ত্ব লোপ না পেলে এদেশে মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া অসম্ভব। সেটা হবে হাওয়ার কেল্লায় আকাশ কুসুম।

এ জাতির প্রাণশক্তি যে সহস্র ধারায় উচ্ছলিত হয়ে ওঠে না, তার কারণ, সামান্য সঙ্গীর্ণ পথেও আপনাকে প্রকাশ করবার সুযোগ তার নেই - এই জনাই কোন দিনই তার নিজেকে জানা ও নিজেকে পাওয়া হল না। পৃথিবীর কাছেও সে অচেনা থেকে গেল। মনের সহিত মনের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের ফলেই চেতনার ভাঙারে শক্তির সঞ্চয় সম্পূর্ণ হতে থাকে - সেই শক্তির সাহায্যেই মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বা সমাজের ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে বা ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে। আমাদের সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার সব কটা পথই রুদ্ধ।

আমরা নারীকে বলি দেবী, তাকে সমকক্ষ মানুষ বলে ভাবতে পারিনে। অবশ্য নারীকে আমরা নিযুত রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে, সব রকম আপদ বিপদের আঁচ থেকে রক্ষা করেই চলি, কিন্তু আগে ঘোঁড়া করে রেখে তারপর তাকে মাথায় করে বয়ে নিয়ে বেড়ানোর দক্ষিণ্য প্রকাশ পায় না। বিধাতার দেওয়া পা থেকে বঞ্চিত করে কাঁধের ওপর স্থান দিয়ে ভাবতে পারি যে তাকে উচ্চপদ দিলুম, কিন্তু দুনিয়ার দরবারে সে পদচ্যুতই রয়ে গেল। মাঝে থেকে আমাদের

পা দু'টায় বিপদ এই হল যে, তারা মনে করে স্থিরভাবে বহন করাই তাদের কাজ, চলা তাদের নয়।

আমরা মানুষকে দরিদ্র করে রাখি এবং সেই দরিদ্রকে ডেকে বলি, তুমি নারায়ণ; সেটা তাকে শ্রেফ উপহাস! তার দরিদ্র্য দূর করার চেষ্টা আমাদের নয় - সেটা বজায় রাখাই কায়েমী নারায়ণ সেবার অঙ্গ বলে বোধ হয়। আমরা মুখে বলি, সর্বত্র স্বহৃদে ব্রহ্ম; কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের দ্বারা মাড়ানো আমাদের নহিত লাগে। তারা যে বামুনের তুল্যই মানুষ, এ কথা আমরা ভাবতে পারিনে। মানুষমাত্রই ব্রহ্ম, সে ঠিক; কিন্তু তাই বলে কি তারা ঐ বামুনের সমান? ব্রাহ্মণ যেন ব্রহ্মারো বড়।

এইভাবে নারীর সঙ্গে পুরুষের, নিম্নস্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের, মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলার অর্থগত, সমাজগত ও ধর্মগত হাজারো রকমের বাধা। অথচ চিন্তের সঙ্গে চিন্তের সঙ্গ যদি সহজ না হয়, অবাধ না হয়, বিচিত্র না হয়, তবে আমাদের সম্পূর্ণতাই বা আসবে কোন্ পথে, সার্থকতাই বা পাবো কোন্ কীকিতে? মিলনের রহস্যই যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রহস্য, দেবার ও পাবার ঐ একটিমাত্রই তো শ্রাণালী।

এযুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা মানুষের মিলনের পথ খুলে দেওয়া, চওড়া করা; সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এরই ওপর। রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়ে, অর্থনীতিক দিক দিয়ে - নানা আদর্শে ও নানানভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টাই আজকের কাজ। এই জন্যই যে কারণে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে আমরা চাই সকলের খনসাম্য, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সকলের সমানাবিবরণ, সেই কারণেই সামাজিক ক্ষেত্রে চাই সকলের একীকরণ। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন যাতে সহজ ও সুন্দর হয়, আমাদের সকল চেষ্টার মূলে সেই প্রেরণা।

কিন্তু শূত্রের দর বাড়িয়ে সবাইকে শূত্রধর বানিয়ে দিলেই এই একীকরণ সম্ভব হবে না, কেননা সামোর প্রতীক ব্রাহ্মণ নয়, সে হচ্ছে ভেদের মূর্তি। সবাইকে শূত্রের মর্যাদা দিয়ে বরণ সেটা সম্ভব। ব্রাহ্মণের অতীত কলঙ্কিত এবং

ভবিষ্যৎ শূন্যাকার - তার প্রাপশক্তি নিঃশেষিত, তার আদর্শের ক্ষেত্র এতই সঙ্কীর্ণ যে, সেখানে কেবল তাদেরই ধরে, ধরিত্রীর সমস্ত মানুষের চোকের পথ আর সেখানে নেই। এই ভারতের শ্রুতী শূত্র, এর আদিম অধিবাসী শূত্র, এর সভ্যতা শূত্র সভ্যতা। ব্রাহ্মণের দিন ফুরিয়ে এসেছে, বামুনের আগেও এই ভারতে শূত্র ছিল এবং শূত্রই পরে থাকবে; কেননা এর প্রাপশক্তি প্রচুর - অমরস্ত্রের সন্তান। ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের মাথা নয়, তার টিকিমাত্র। পৌরাণিক দৃষ্টিকোণে লোণ পেলে তাঁর একমাত্র ক্ষতি এই হবে যে, তাকে ভয়ঙ্কর আধুনিক দেখাবে।

কেউ হয়ত ভেবেই আকুল হবেন, বামুন যদি গেল তবে ব্রহ্মচর্চা করবে কে। এক দল লোক ব্রহ্মসেবা, আরেক দল শক্তিসেবা এবং তৃতীয় দল পদসেবা করলে তবেই না হবে আদর্শ সমাজ। কিন্তু আহা, আজকের মানুষ যে সম্পূর্ণ হতে চায় - ব্রহ্মবিদের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য, বৈশ্যের ঐর্ষ্য, শূত্রের শ্রম - সবাতাই সে চায় সমান অধিকার; ভাণ্ডাভাগি হিসেবে আধাখানা মানুষ হয়ে তার সুখ নেই। মনুষ্যত্বের পূর্ণতার জন্য যদি ব্রহ্মচর্চার প্রয়োজন থাকে, তাহলে সে প্রয়োজন প্রত্যেক মানুষের - কোন বিশেষ শ্রেণীর ওপর তাঁর বরাত দেওয়া যায় না। শিলে যা হয় তা ব্রহ্মচর্চা নয়, ব্রহ্মচর্চা - কেননা এই জিনিসই একজনে পাকিয়ে সকলের পাতে পরিবেশন করতে পারে।

কেবল বিভিন্ন জাতির সভ্যতা আত্মসাৎ করেই হিন্দু সভ্যতা বিরাট হয়নি, বিভিন্ন জাতির রক্তের সঙ্গেও এর মিশ্রণ ঘটেছিল। অনার্য, শক, হুণ, হাবিড়ের সঙ্গে যথেষ্ট আর্থরস্ক মিলিত হয়ে হিন্দুদের দেহ গড়েছে, বৌদ্ধযুগের তো কথাই নেই, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক, কৌলীন্য প্রথার ফলে, বামুনের সঙ্গেও এই শূত্র রক্তের নেপথ্য মিলন ঘটেছে। অদূর ভবিষ্যতে মুসলমান ও খৃষ্টানকে আত্মসাৎ করে এই শূত্রসভ্যতা আরো মহত্তর হবে। মিলনের পথে মহিমার পথে আপনাকে সম্পূর্ণ করবে। অচলায়তন ভেঙে মুক্তিপথ রচনায় দায়িত্ব তার। ভারতের সভ্যতা বিপ্রবর্ণ নয়, শূত্রবর্ণ; ভারতের ভবিষ্যৎও তাই।



মনুবাঙ্গী আইনে দলিত নারীর শান্তি, উত্তরপ্রদেশ ২০০৫

ধর্মশাস্ত্র ও জাতিভেদ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ধর্মশাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত সমাজ-ব্যবস্থার মূল কথা হল, এই সমাজে মাত্র দুই শ্রেণীর মানুষ থাকবে: দ্বিজ ও শূত্র। দ্বিজ মানে, যাদের দুবার জন্ম-একবার অবশ্য মাতৃগর্ভে, কিন্তু দ্বিতীয় বার উপনয়নের ফলে। যাদের ক্ষেত্রে উপনয়নের বিধান আছে, তাদের দুবার জন্ম; যাদের ক্ষেত্রে উপনয়ন নিষিদ্ধ তাঁদের মাত্র একবার জন্ম। এই ধারণার মূলে কোন আদিম বিশ্বাসের প্রভাব - তা নিয়ে অবশ্য নৃতত্ত্ববিদেরা আলোচনা করবেন। আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে মনে রাখা দরকার, মনু প্রভৃতি আইন কর্তাদের মতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের উপনয়ন হবে; শুধুমাত্র তাঁরাই দ্বিজ। শূত্রদের উপনয়ন নিষিদ্ধ; তাই তাঁদের শুধু একবারই জন্ম। সমাজে শুধু এই দুই শ্রেণীর মানুষ থাকবে: দ্বিজ ও শূত্র। মনু যেমন বলেছেন “ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের মানুষ দ্বিজ; চতুর্থ বর্ণ শূত্রের একবারই জন্ম; তাছাড়া কোন পঞ্চম বর্ণ নেই। ” ১০/৪

ধর্মশাস্ত্রকারদের আদর্শ সমাজটিতে তাহলে শুধু দুই শ্রেণীর মানুষ: দ্বিজ ও শূত্র। তাঁদের আরো বিধান এই যে কার্যিক শ্রমের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের নয় - দ্বিজদের নয়। তাহলে কার দায়িত্ব? শুধুমাত্র শূত্রের দায়িত্ব। অর্থাৎ সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ কার্যিক শ্রমের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে মুক্ত, অপর শ্রেণীর মানুষের উপরই কার্যিক শ্রমের প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া, অনুমান করা কঠিন নয়, সমাজের মোট জনসংখ্যার তুলনায় ব্রাহ্মণাদি দ্বিজের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হতে বাধ্য। অতএব, সংক্ষেপে সমাজের একদিকে পরশ্রমজীবী সংখ্যালঘু শ্রেণী, অপরদিকে সংখ্যাগুরু শ্রমজীবী শ্রেণী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীটির নামই শূত্র।

ধর্মশাস্ত্রকারেরা শূত্রদের কর্তব্য এবং জীবনধারণের মানও বৈধ দিয়েছেন। সুবিদিত হলেও এখানে কিছুটা নমুনা দেখা দরকার। মনু বলেছেন, শূত্রদের

একমাত্র কর্তব্য হল দ্বিজদের - বিশেষত ব্রাহ্মণের - সেবা; এছাড়া তারা যাইই করুক না কেন, সবই নিশ্চল হবে। ১০/১২৩

অবশ্য এই সেবাকার্য্য সুসম্পন্ন করতে হলেও শূদ্রদের পক্ষে জীবন ধারণ প্রয়োজন। কিন্তু তার মানও মনু বেঁধে দিয়েছেন: “ তাদের খেতে দেবে উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরতে দেবে জীর্ণ বসন, শুতে দেবে খড়ের উপর বা বড়জোর ছোঁড়া কাঁধায়। ১০/১২৫

এবং একটি বিষয়ে মনু বিশেষ সতর্ক করে দিয়েছেন: “ ধনার্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধনসঞ্চয় করতে দেওয়া হবে না; কেননা শূদ্র ধনসঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণের বড় কষ্ট হয়।” ১০/১২৯

তাহলে এই হল ধর্মশাস্ত্রকারদের আদর্শ সমাজ: একদিকে সংখ্যাগুরু শ্রমিকেরা খেটে মরবে; কিন্তু সুখভোগের কোন অধিকারই তাদের থাকবে না; অপরদিকে তাদেরই সেবার উপর নির্ভর করে - অর্থাৎ তাদেরই শ্রমের উপর নির্ভর করে - অপর শ্রেণীর মানুষ শ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ না করেও সমস্ত সুখভোগের কমবেশি অধিকারী হবে।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ক্রীতদাস-ব্যবস্থার মতো সমাজব্যবস্থা ভারতীয় ইতিহাসে ছিল কিনা - এ নিয়ে ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করেন। কিন্তু একটি বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই: দাস-প্রথার সমর্থনে গ্রীস ও রোমান পণ্ডিতেরা যে মতাদর্শ প্রচার করেছেন তার সঙ্গে আমাদেরও ধর্মশাস্ত্রকারদের মতাদর্শে খুব মৌলিক পার্থক্য নেই। এই কথাটি মনে রেখে দার্শনিক চিন্তা - চৈতন্যের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

ধর্মশাস্ত্রকারদের আদর্শ সমাজটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অবশ্যই পাহিক পেয়াদা দরকার; না হলে সংখ্যাগুরু শ্রমিক মানুষ তার শ্রমের সমস্ত ফলভোগটা অপর এক শ্রেণীর কাছে ছেড়ে দেবে কেন? কিন্তু শুধু পাহিকপেয়াদাই নয়। বিশাল শ্রমজীবী শ্রেণীকে শাসনে রাখার জন্যে আরো একটি অস্ত্রের প্রসিদ্ধি

আছে।

তা হল অন্ধ ধর্মবিশ্বাস বা শাস্ত্রবিশ্বাস। শূদ্ররা দ্বিজদের জন্যে খেটে মরতে রাজি হবে কেন? শাস্ত্রের নজির দেখিয়ে মনু বলেছেন এই কারণেই তো ভগবান শূদ্রদের সৃষ্টি করেছেন।

মনু বলেছেন, “ ভগবান প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রদিগের পক্ষে এই কর্মের ভার সমর্পণ করলেন যে, তারা অসুখাবিহীন হয়ে শুধুমাত্র এই বর্ণব্রহ্মের সেবা - ওশ্রাব্য করবে।” ১/৯১

মনু বলেছেন, “ কেনাই হোক বা না কেনাই হোক, শূদ্রকে দিয়ে শুধুমাত্র দাসের কাজ করাবে। কেননা স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের দাসত্ব করার জন্যেই তাকে সৃষ্টি করেছেন। প্রভু যদি তাকে মুক্তিও দেন তাহলেও শূদ্র দাসত্ব মুক্ত হতে পারে না। কেননা দাসত্বই তার স্বাভাবিক ধর্ম। তা থেকে শূদ্র মুক্ত হবে কি করে?” ৮/১৬-১৪

সর্বোপরি মনুর বক্তব্য এই যে তাঁর বিধানগুলি তাঁর নিজের উদ্ভাবন নয়। তার পিছনে খোদ ভগবানের সমর্থন আছে: “ ব্রহ্মার পৌত্র ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র রচনা করেছেন।” ১/১০২।

কিন্তু শুধু দেশের আইনকর্তারাই নন। মুষ্টিমেয় সুখ - সুবিধা যোগাবার উদ্দেশ্যে বিশাল শ্রমজীবী শ্রেণীকে তাঁবে রাখবার জন্যে অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস যে এক অমোঘ অস্ত্র - এই সহজ কথাটি গ্রীক ও রোমের প্রাচীন রাজনীতিবিদদেরাও স্পষ্টই বুঝেছিলেন।

মতাদর্শের দিক থেকে ভারতীয় আইন কর্তাদের সঙ্গে ওই গ্রীক রাজনীতিবিদদের প্রধান তফাৎটা এই যে সমাজ শাসনের পক্ষে উপযোগী অন্ধ বিশ্বাসকে গ্রীকরা কুসংস্কার বলেই শনাক্ত করেছেন; আমাদের আইনকর্তারা প্রাচীন মিশরের আইনকর্তাদের মতোই সেই বিশ্বাসকে অমোঘ শাস্ত্রীয় সত্য

বলে ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু যে নামেই উল্লিখিত হোক না কেন, শ্রমিক সাধারণকে তাঁবে রাখার ব্যাপারে অন্ধ ও অটল বিশ্বাসের উপযোগিতা কালাপানির এপার-ওপার দুপারেই স্বীকৃত। অতএব শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিতে বুদ্ধির বিচারকে শর্তহীন প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারকে - খুব একটা ভাল চোখে দেখবার কথা নয়। ভারতীয় আইনকর্তারা হেতুবিদ্যা বা অক্সিফিনী নিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ নিবিদ্ধ বলেই ঘোষণা করেছেন।



গুজরাট ২০০২

সংরক্ষণ বিরোধী উদ্ভাদনা কিসের স্বার্থে

কে.বালাগোপাল

জাত বিষয় নিয়ে আমাদের ভণ্ডামি যত বেশি সেখা যায় অন্য কোন ব্যাপারে ততটা নয়। আবার জাতপাতের মতো অন্য কোন এমন বিষয় নেই যা আমাদের ভেতরের কদর্যতাকে এমন অনায়াস নির্লজ্জতায় বহিরে নিয়ে আসে। যেই মুহূর্তে ভি.পি.সিং পঞ্চাংপদ জাতিগুলির জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ ঘোষণা করলেন সেই মুহূর্তেই বড়ের মতো সারা দেশে আছড়ে পড়ে উদ্ভাদনা আদিমতা। সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সমস্ত জনমত গঠনের সংস্থাগুলোতে বইতে শুরু করল এই ঝড়।

এক সময়ের নাগরিক স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা পীড়াদায়ক জাতবিদ্বেষপূর্ণ লেখা ও সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করলেন। তিনি পাঠকদের তাঁর নিজস্ব কায়দায় পবিত্র বর্মোপদেশ ও সরকারের ভিতর ও বাইরের সমস্যা সম্পর্কে কৌশলগত উপদেশ দেওয়ার অভ্যাস শিকের তুলে দলিতদের বিরুদ্ধে এমন সব অপমানকর লেখা লিখতে শুরু করলেন যে এর সামান্যটুকুও যদি তিনি উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে লিখতেন তাহলে তিনি তাদের হাতেই কোতল হয়ে যেতেন। এইচ এম সিরভাই এর মতো একজন স্বীকৃত সংবিধান বিশেষজ্ঞও কিছু সময়ের জন্য বহুমূল্যে অর্জিত ভারতীয় সংবিধানের সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের আদর্শকে ভুলে গিয়ে মেধা ও প্রতিভার ধ্বংস ও মৃত্যু হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যবাদ মেধা ও প্রতিভার ভিত্তিকে অধীকর করে। যে গিরিলাল জৈনের আপাত সুভদ্র লেখনীশৈলী প্রশমিত হয়ে রাজীব গান্ধীর স্বার্থের ওকালতি করত তাই ঝাঝালো গদ্যে পরিবর্তিত ভি.পি.সিং সরকারের বহিস্কার দাবি করেছে। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলোর পত্রলেখকরা যাদের শাস্তিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী এবং কঠনসাধ্য গদ্য একটা প্রবাদ বিশেষ - সহসাই তা কাজে পরিণত হয়ে সংরক্ষণ বিরোধীদের

আন্দোলনকে ১৯৬৮-র ফরাসি ছাত্র অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করে দিল।

ইন্ডিয়া টুডে নামে যে কাগজটা সাধারণভাবে বাস্তব সম্মত এবং আবেগ বর্জিত সংবাদ পরিবেশনের ভাণ করে থাকে, সে তার সমস্ত ভণিতাকে জলাঞ্জলী দিয়ে বিপুল সংখ্যক ইংরাজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু এবং মালয়ালি ভাষার পাঠকদের মতামতকে গুঁড়িয়ে দিতে সম্মুখ সমরে নেমে পড়েছে। ইন্ডিয়া টুডে, এটাকে সরকার ও তার সমর্থকদের দীন বৈরাগ্যের প্রদর্শন বলে নিন্দা করল এই কারণে যে, তারা কেন প্রকাশ্যে মণ্ডল কমিশনের বিরোধিতা করছেন না। ইন্ডিয়া টুডে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রচলিত আক্রমণাত্মক এক বাস্তবিত্ত ছেপে ছিল। ছবিতে দেখানো হয়েছে একটা সমুদ্রগামী জাহাজে ভি পি সিং এবং একমূল তপসিনী জাতি / উপজাতি এবং পশ্চাৎপদ জাতির লোক অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং জাহাজ ডুবন্ত উচ্চবর্ণের ছাত্রদের প্রতি নৃশংস ভাবে দাঁত বার করে হাসছে। ছাত্ররা ডুবতে ডুবতে তাদের ডিগ্রি সার্টিফিকেট ইত্যাদি উঁচুতে তুলে ধরে আছে। বাস্তবে এই ধরণের নিষ্ঠুর বাস্তবিত্ত করাও কঠিন, যত রকম বিজ্ঞাপন সংরক্ষণ নিয়ে গুনতে হয়েছে।

গোটা উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় হঠাৎ একটা নিরেট পাথরে পরিণত হয়েছে। মৌলবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ, মার্ক্সবাদী এবং গান্ধীবাদী, শত্রু ও গ্রামবাসী সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অন্য কোন বিষয়ই কখনো তাঁদের এরকম এক করতে পারে নি। তারা শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে চালিত হল। এই শিক্ষাবিদদের সবাই - কী বাম, কী দক্ষিণ, কী মধ্যপন্থী - হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন যে, সমাজের মতোকার আসল বিভাজনটা হল মেধাবী ও আনাড়ি এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শ্রেণী পার্থক্যের কথা বলতে নিজেদের ফারা নকশালপন্থী বলত, তারা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলল, ভারতীয় সমাজের একমাত্র শ্রেণী ভাগাভাগিটা হল - ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে। এই রকম অসম্ভব মন্তব্য শোনা গিয়েছে হরিয়ানার এক বিজেপি নেতার মুখে। নিঃসন্দেহে জাতিপাত

এদেশের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে শেষে ধ্বংস হবে। এটা দীর্ঘকাল পর্যন্ত টিকে যাবে।

প্রত্যেকই হঠাৎ একটা অবিশ্বাস্য আবিষ্কার করে ফেলল যে মেধা বলে একটা কিছু আছে যেটা আজকের দিনে ভারতীয় এলিটদের দখলে। একটা নতুন শব্দ একটা নতুন ধোঁকা শাসক শ্রেণীর মতাদর্শগত প্রচারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পুরো চারটে দশক ধরে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দেশের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আধিপত্য করেছে; দেশের সমস্ত জমি, ব্যবসার মূলধন, আর্থিক সম্পদ, শিল্প কারখানা ইত্যাদি নিজেদের দখলে রেখেছে; প্রশাসনের সমস্ত উচ্চপদ শিক্ষা বিজ্ঞান পরিগণিত জ্ঞান, উন্নত চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ কৃষিপণ্ডিত করে রেখেছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও তারা দেশটাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে? স্বল্পতা ও মহুর গতির বৃদ্ধিসহ অর্থনীতি প্রায় দুই অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতিতে জর্জর। তাদের রাজনীতি যাবতীয় সংকটে জর্জর এবং অসততা ও দুর্নীতিতে বিকৃত, কৃষি এমনকী সবুজ বিপ্লবের সফলতা প্রদর্শনের জায়গাগুলোতেও উৎপাদন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রশাসন অদক্ষ, কল্যাণ শক্তিহীন এবং অবশ্যই দুর্নীতিগ্রস্ত। আর এরাই আজ দাবি করছে যদি অন্যদের (পশ্চাৎপদের) এসব জায়গায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে ভারতের উন্নয়নের মৃত্যু ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

এটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, মণ্ডল কমিশনের তালিকা যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞান সম্মত কী না। ওই তালিকা নিঃসন্দেহে সুচিন্তিত রিপোর্টের দুর্বলতম অংশ। পশ্চাৎপদ জাতিগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য একটা যুক্তিসঙ্গত জাতীয় বিতর্কের আয়োজন করা যায় এবং তাতে করে বাস্তব সম্মত মানদণ্ড বেরিয়ে আসবে। যদি এই বিষয়টাই বর্তমানে ইস্যুর সব কিছু হয়ে থাকে তাহলে এটা বোঝা দরকার দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি গত দু'দশকের বেশি সময় ধরে একটা যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাজন রীতির উপর ভিত্তি করে পশ্চাৎপদজাতিগুলোর জন্য সংরক্ষণের নীতিপ্রয়োগ করে চলেছে। কিন্তু উচ্চবর্ণের জাতিগুলোর আন্দোলনের ধরণ এবং স্লোগান বাছাইয়ের ধরণ থেকে প্রমাণ হয় এই বিষয়টা

(অর্থাৎ সংরক্ষণের তালিকা) আদৌ তাঁদের ইস্যু নয়। একটি যুক্তিসঙ্গত বিতর্ককে যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং অবশ্যই যৌথভাবে মীমাংসা করা যায়। কিন্তু একটা জাতিবাদী অগ্রন্থ কেবলমাত্র জাতিগত ভাবেই মোকাবিলা করা উচিত, প্রয়োজনে রাজ্যতেই তার মোকাবিলা হবে। উচ্চবর্ণের যুবকরা কেবলমাত্র যে পশ্চাৎপদের সর্বত্র অপমান এবং পীড়নই করছে তাই না জাতি দাঙ্গা উত্তেজিত করে দেবে। যুবশক্তি একটা লড়াইয়ের নামে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাদের অভিভাবকরা তাদের লড়াইয়ের মরদায়ে ঠেলে দিয়ে প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় লিখে বাড়িতে বসে।

সংরক্ষণের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লেখকরা যারা সংবাদপত্রের সম্পাদক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে দৌরভাগিন, তাঁরা গলা বাড়িয়ে দাবি করছেন সংরক্ষণই একমাত্র জাতিভেদকে মদত যোগাচ্ছে। এই সব ব্যক্তির আবার মুকবির মতো উপদেশও দিয়েছেন যে, সংরক্ষণের সূত্রে যারা কোন অফিসে বা সংস্থায় চূকছেন, তাঁরা কাজের জায়গায় লালিত অপমানিত হয়ে থাকেন। তাঁদের আত্মমর্যাদার স্বার্থেই সংরক্ষণের সুবিধা ত্যাগ করা উচিত - এটা সেই চোরের মতো কথা, যে মজি হলে অন্যের মূল্যবান জিনিস পকেটস্থ করে থাকে, তাই পকেটে কিছু না রাখাই ভাল।

সরকার উচ্চপদস্থ অফিসারদের সংগঠন 'এ্যাসোসিয়েশন অফ দি ক্রাস ওয়ান অফিসার্স অফ দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া' সরকারের কাছে এক আবেদনে জানিয়েছে, শুধু মন্ডল কমিশনের সুপারিশকেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে তাই না, এমন কী তপসিলী জাতি / উপজাতি ও আদিবাসীদের বর্তমানের জন্য চালু থাকা সংরক্ষণকেও তুলে নিতে হবে। তাঁদের যুক্তি, এই ধরনের রাজনৈতিক উপযোগিতাবাদ প্রশাসনের দক্ষতার উপর প্রভাব ফেলবে। এখন যেমন ক্রাস ওয়ান অফিসারদের ৯৫.৩২ শতাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু (সামান্য কিছু মুসলমান ও খ্রীষ্টান এলিটও আছেন)। এঁদের দক্ষতার রেকর্ড দেশের ৮৫ ভাগ মানুষ সম্পর্কে এই নকম জাতিবিদ্বেষপূর্ণ উক্তি থেকে কতটুকু প্রমাণিত হয়? অন্য আর

কোন বিষয়েই এই ধরনের খোলাখুলি প্রবঞ্চনা ও দু'মুখোপনা সহ্য করা হত না। কিন্তু আমাদের দেশে জাতপাতের ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত বিষয়, তাই এখানে এসব চলে।

সংবাদ মাধ্যমগুলি যে এব্যাপারে অসাধারণ ঐক্য দেখিয়েছে তা সত্যিই অবাক হবার মতো। এই সব সংবাদপত্র কর্মীদের একবারও এটা ভেবে দেখার কথা মনে হয় নি যে, সংবাদ মাধ্যমগুলির এই একতা সম্ভব হল কী করে? এই ঐক্য কি শুধুমাত্র এই দেশের ভবিষ্যতের জন্য গভীর উদ্বেগ বশত, যা একমাত্র সংবাদ মাধ্যমেরই আছে। নাকি আরোও কোন গোপ্য সত্য এই ঐক্যের পিছনে আছে? গোটা সংবাদ জগতের মালিক-কর্মচারীই তো উচ্চবর্ণের হিন্দু তাও অব্যাহত প্রধানত ব্রাহ্মণ। এই অভিনব ঐক্যের কারণ কী এটা নয়? এজগতের সব কিছুর সম্পর্কেই তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন। সমাজতন্ত্র ও পুঞ্জিবাদ, বেসরকারি ক্ষেত্র ও সরকারি ক্ষেত্র এবং জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত প্রত্যেকটা বোধগম্য বিষয়েই তাঁদের ভিন্নমত।

সবাই জানেন, কর্মসংস্থানের প্রশ্নটাই যদি এব্যাপারে সব কিছু হত তাহলে সংরক্ষণটা খুবই ছোট ইস্যু হত। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারি সেক্টরের ভূমিকা তার লম্বীকৃত শেয়ারের সঙ্গে কখনোই মানানসই নয়। বর্তমানে তাও ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। অর্থলব্ধী উদ্যোগগুলি সবই বেসরকারি হাতে চলে যাচ্ছে। মূল শিল্পগুলোকে (Basic Industries) প্রাইভেট সেক্টরে হস্তান্তর করার কথা খোলাখুলি বলা হচ্ছে। এমনকী স্বাস্থ্য এবং সেবার মতো অত্যাবশ্যক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারি হাতে চলে যাচ্ছে দ্রুত। ভি পি সিং অবশ্য বলেছিলেন, তিনি কোন রাজ্য সরকারকেই মন্ডল সুপারিশ কার্যকর করার জন্য চাপ দেবেন না। আর প্রতিশ্রুতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ওড়িশা এবং হিমাচল প্রদেশ সরকার বলে দিয়েছে তারা মন্ডল সুপারিশ কার্যকর করবে না। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের সরকার গুলিও হয়তও এই পথ অনুসরণ করতে যদি না সেখানে ওই সব রাজ্যে যাদব মুখ্যমন্ত্রী থাকত। সংরক্ষণের অতি আবেগ পূর্ণ বিরোধিতাকে কর্মসংস্থান

অথবা বেকারির দিক থেকে নয়, বরং বর্ণব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বিচার করতে হবে। বিচার করতে হবে সম্পদ বন্টন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা যে ধারাবাহিক ভূমিকা পালন করেছে সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে। কারণ, সংরক্ষণ সরাসরি বর্ণ ব্যবস্থাকে আঘাত করছে, যে আঘাতকে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সহ্য করতে অক্ষম।

বিষয়টিকে ভাল করে দেখতে হলে দেখে যে পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যায় ও যে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে সেগুলি জনগণের মধ্যে বিলি করা হয় সেগুলির সামগ্রিকতাকে বুঝতে হবে। পুঁজি, জমি ও প্রকৃতির বাকি অংশ এই হল প্রধান তিনটি উৎস। এগুলির মালিকরাই ক্ষমতা এবং সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে আসছে। বীদের এই উৎসের উপর মালিকানা নেই তাঁরা শ্রমের মাধ্যমে নিজেদের জীবনযাপনের রসম জোগাড় করছেন। এগুলির মালিকানার সিংহভাগই উচ্চবর্ণের অধিকারে অথবা রাষ্ট্রের হাতে সীমাবদ্ধ। আবার রাষ্ট্রের হাতে থাকা উৎসগুলিও আবার উচ্চবর্ণের লোকেরই ভোগ করে থাকে। এটা বর্ণ জাতপাত ও শ্রেণীর মধ্যে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন আন্তঃসম্পর্ক নয়। আবার কোন ঐতিহাসিক অবশেষও নয় বরং একটা বাস্তব সম্পর্ক এবং জীবন্ত বাস্তব। যখন জাতপাতের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ এসে দাঁড়ায় তখন আমরা শুধুমাত্র আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি এবং অন্তের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা থেকেই সরে দাঁড়াই তাহি না, এমনকি আমাদের মুখ্যপেশী থাকা বিষয়গুলোকেও দেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। মন্দির নিয়ে বাবর কী করেছে, কী করেনি, অযোধ্যায় মসজিদের জায়গায় মন্দির ছিল কী ছিল না, রাম যেখানে জন্মেছিল নাকি জন্মায়নি, সেগুলো ইতিহাসের বিষয়, অতীতে ঘটে থাকা অথবা না ঘটে থাকা বিষয়। কিন্তু জাতপাত একটা অতি জীবন্ত বাস্তব। মধ্যযুগের ভারতে সম্পদ বন্টন ও ক্ষমতা অর্জনের প্রায়ে বর্ণ ছিল প্রধান নির্ধারক এবং শোষণের পক্ষে মুখ্য তাত্ত্বিক সমর্থন। বর্তমানে পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং রাজনৈতিক গণতান্ত্রিকরণ সত্ত্বেও এটা আজও মুখ্য পার্থক্য হল, ধর্মশাস্ত্রের সেই যুগে এটা যে উচ্চ অবস্থানে ছিল সেখান থেকে সে বৈধভাবেই

রায়েছে।

বর্ণব্যবস্থা বৈধভাবে মৃত কিন্তু রাজনীতিগত এবং মতাদর্শগত ভাবে চরম ভাবে মূর্ত। যদি এটা বিচার ব্যবস্থার বাস্তব দিক থেকে গুলিয়ে দেবার জন্য একটা সাধারণ যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে এই অস্তিত্বহীন বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেকেই আকাশ কুসুম কল্পনা ত্যাগ করা উচিত। ভারতের মতো একটা দেশের শাসকশ্রেণীর বিচার ব্যবস্থাতে সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ছত্র গাভীর আরোপ করার প্রগতিশীল সামর্থ্যটুকুও নেই। এই বিষয়টাকে বোঝার ক্ষেত্রে অক্ষমতার অন্যতম প্রধান কারণ হল, সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের বর্ণভেদ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ আছে তা সাধারণভাবে অসম্ভাবজনক।

বিধানসভা অথবা লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী টিকিট, সরকারি চাকরি, ঠিকাদারি, কো-অপারেটিভ খণ, শিল্পের লাইসেন্স, অর্ডার সাপ্লাই, বেসরকারি ক্ষেত্রে ম্যানেজারিয়াল কাজকর্ম, কোন উপাচার্যের পদ এমনকি প্রশাসনের সঙ্গে অনুকূল সম্পর্ক অথবা বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টি র কোন লাভজনক পদ, যেখানে শিক্ষকরা দায়মুক্তভাবে বর্ণ এবং শ্রেণী ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন এগুলোর কোনটাই বর্ণগত পরিচয় ছাড়া পাওয়া যাবে না। ভারতীয় বিপদ (এগিট) দের কম্পোজিশন নির্ধারণ করতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। সম্পত্তিবান শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করতে, মর্যাদা বজায় ও বৃদ্ধি করতে বর্ণগত অবস্থানকে ব্যবহার করেন। উচ্চবর্ণের যীরা জল্পসূত্রে তেমন বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাননি, তাঁরা তাঁদের বর্ণগত অবস্থানকে ব্যবহার করে থাকেন পর্যাপ্ত সম্পত্তি অর্জন ও রাজনৈতিক সিঁড়িতে ওঠার জন্য। শাসক শ্রেণীর ভিতরের হৃদে এলিটদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে জোড়া লাগাতে মধ্যবিন্ত শ্রেণীকে সমাবেশ করতেও জাতপাতের ভূমিকা অসীম। উচ্চবর্ণের মধ্যে যারা দরিদ্র, তাঁদের একটা অতিরিক্ত সুবিধা আছে, যেটা থেকে দলিতরা বঞ্চিত। এই সর্বোচ্চবর্ণের দরিদ্ররা ধনীদের সঙ্গে বর্ণগত সম্পর্কের

সুবাদে ছোটখাটো চাকরি কিংবা ছোট মাপের ঋণের সুবিধা পেয়ে থাকে। সবাই অবশ্য এই সুযোগ পায় না তবে সবার ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনাটি যে বজায় আছে এটা অনস্বীকার্য। উচ্চবর্ণের লোকেরা এই সব ক্ষেত্রে তাঁদের বর্ণপরিচিতিতে কাজে লাগান। কিন্তু যখনই পশ্চাৎপদ বর্ণের লোকেরা রাষ্ট্র ক্ষমতার দরজায় পা রাখতে অথবা একটা সামান্য কেরানির চাকরির জন্য যখন তাঁদের বর্ণ পরিচিতিতে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন তখনই শুরু হয়ে যায় বিপুল চিংকার এবং বলা হতে থাকে মেধার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। উচ্চবর্ণের জাতিবাদকে কখনই জাতিবাদ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ, সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অস্তিত্বটাকেই একটা স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। এই সুযোগটা তাঁরা নেন। বর্ণবাদ এর বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। উচ্চবর্ণের লোকেরা 'যোগাযোগের' সুবাদে যে অলিখিত সংরক্ষণ ভোগ করে থাকে তা পশ্চাৎপদ জাতিগুলির কল্যাণের উদ্দেশ্যে তৈরি যাবতীয় সুপারিশের তুলনায় অনেক বেশি প্রভাবশালী। কিন্তু তবু এটাকে সংরক্ষণ হিসাবে দেখা হবে না।

তবে সম্পর্ক বা যোগাযোগই সব নয়। সমাজের মধ্যে সংরক্ষণের যে তালিকা পাওয়া যায় তার হিসেব অনেক লম্বা। যদি সেই তালিকাকরণ বিবিধ আকার না নেয় এবং যদি সেগুলো দলিত জাতিগুলোর কল্যাণ না হয় তাহলে আর সেগুলিকে কেউ সংরক্ষণ হিসাবে দেখে না। ভাল ভাল সরকারি স্কুলের শিক্ষাদীক্ষা প্রায় সব উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের শিশুদের জন্য সংরক্ষিত আর এই সংরক্ষণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। যদি কেউ বলে যে, দলিতদের সম্পর্কে যেমন বলা হচ্ছে যে, একটা প্রজন্মের পর তাদের জন্য বরাদ্দ সংরক্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হবে ও তাদের নিজেদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে। তেমনই উচ্চবর্ণের পিতামাতাদের সন্তানদেরও একটা প্রজন্মের পর কেসরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হবে তাদেরও সরকারি স্কুলেই পড়তে হবে তাহলে এই কথাটা সবারই ভয়ঙ্কর অর্থোক্তিক মনে হবে বলে আমার বিশ্বাস। বাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ যেটা বইপত্রের শিক্ষা থেকে

পাওয়া যায় না তা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য ধারায় প্রভাবিত উচ্চবর্ণের পরিবারগুলোতেই সংরক্ষিত ও সীমাবদ্ধ। যদি কেউ বলে যে, এতদিন এইসব লোকেরা বহুপ্রজন্ম ধরে সংরক্ষণের এই সুবিধাগুলো ভোগ করে এসেছে, এখন থেকে ব্রাহ্মণ সন্তানদের জন্মের পরপরই কোন একটা হোস্টেলে অন্যান্য বর্ণের শিশুদের সঙ্গে একই সাংস্কৃতিক পরিবেশে থাকতে হবে তাহলেই এটা একটা ভয়ঙ্কর প্রস্তাব হিসেবে দেখা হবে। সঠিক 'যোগাযোগ' হল সমাজে ব্যাপক ভাবে চালু থাকা আর একটা সংরক্ষণ। আর এটাও শুধুমাত্র খনী এবং সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দ। এই সংরক্ষণও একটা বা দুটো প্রজন্মের পর বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরোও জেরালো হতে থাকবে।

তবে সব কিছুই চেয়ে বড় সংরক্ষণটি হল সম্পত্তিগত সংরক্ষণ। সম্পত্তি কেবলমাত্র সম্পত্তিহীনদের বংশধরদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। মেধা ও প্রতিভা উত্তরাধিকারী থাক বা না থাক বংশপরম্পরায় তা সংরক্ষিত। যদি কেউ প্রস্তাব দেয় যে, এখন থেকে আর সম্পত্তির মালিকদের সন্তানদের উপর তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্তাবে না বরং উচ্চতম মেধাবান ব্যক্তিই ঐ সম্পত্তি পাবে তা হলে এটাকে পবিত্রতম অধিকারের মর্যাদাহানি বলে বিবেচনা করা হবে। যদি মেধাহীন ব্যক্তিদের জাতি ও বর্ণের কারণে চাকরি দেওয়াটা জাতীয় বিপর্যয় বলে ভাবা হয় তাহলে শুধুমাত্র বংশগত অনিবার্যতার কারণে মেধাহীন ব্যক্তির কাছে সম্পত্তির অধিকার বর্তানোও জাতীয় বিপর্যয়। কেউ যদি কোন সম্পত্তিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে অসমর্থ হয় তাহলে আগে বা পরে যখনই হোক ঐ সম্পত্তি সে নষ্ট করবেই। আমি জানি কেউই এই বক্তব্যকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে না।

আমরা ভালভাবেই জানি বাস্তব জীবনে এইরকম কিছুই ঘটে না।

জান এবং যোগ্যতার যে সংজ্ঞা এখন পর্যন্ত বজায় আছে সেটা নিয়েই

আপত্তি সবচেয়ে বেশি। আমরা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু তত্ত্বর থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে জ্ঞান সম্পর্কে সব চেয়ে অগণতান্ত্রিক সংজ্ঞা শ্রমজীবী মানুষদের সম্পর্কে জানা ও তাদের কাজকর্ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণকে অস্বীকার বলে নস্যাত্ন করে থাকে। এই সব শ্রমজীবী মানুষেরা কৃষি বিষয়ে জ্ঞান, কাপড় বোনার জ্ঞান, কাঠ এবং লোহার কাজের জ্ঞান এমন কী মৃতদেহ যথাযথ সংস্কারের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী। এই সব জ্ঞানের মধ্যেই সমাজের বস্তুগত জীবনকে রূপান্তরিত করার ভিত্তি বর্তমান, অথচ ব্রাহ্মণ্যবাদ এটাকে জ্ঞান বলেই স্বীকার করে না। এই অস্বীকার শ্রমজীবী মানুষদের উৎপাদিত বস্তু সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আপনারা শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন সম্পর্কে দক্ষতা ও জ্ঞানের দাবিটাকে অস্বীকার করবেন আবার তাদের উৎপাদিত ফসল থেকে তাদের বঞ্চিত করবেন। আর কেবলমাত্র শ্রুতি এবং শ্রুতির উপর দখল থাকলেই তাকে জ্ঞান বলে চালাবেন এবং সে সম্পর্কে পাণ্ডিত্য না থাকলেও তাকে মেধা বলে ধরে নেবেন। যদি ভারতবর্ষ ঠিকমত একটা গণতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারত এবং যদি এদেশের শ্রমজীবী মানুষদের অধিগত জ্ঞান থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা জন্ম নিত তাহলে সম্ভবত আমরা এর সাহায্যেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে সৃষ্টি তত্ত্বের ধারণাকে ভেঙে দিতে পারতাম। তা সত্ত্বেও আমরা এদেশের মানুষের পরম্পরাগত জ্ঞানের সাহায্যে সেই ভিত্তিটাকে পুরোপুরি ভেঙে দিচ্ছি এবং অর্থনীতি ও পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে বিদেশ থেকে ধার করা বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের সঙ্গে এই পরম্পরাগত জ্ঞানকে যুক্ত করছি। কিন্তু এই পুস্তক নির্ভর জ্ঞান পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে একচেটিয়া হয়ে আছে। কাজেই জ্ঞান সম্পর্কিত ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণাই এখনও আমাদের স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচিকে নির্ধারণ করেছে, আর এই বই থেকে শেখা-র ব্যাপারে দক্ষতাকেই মেধা বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পাঠ্যক্রম ধ্বংস করতে হলে এগু জায়গায় কৃষি বস্ত্রবয়ণ, কাঠের কাজ ইত্যাদির জ্ঞানকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবতে হবে। কল্পনা করুন, ঐ সব স্কুলে ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের লোকেরা তাহলে কী বিপুল পরিমাণ সমস্যায় পড়বে। মেধা সংক্রান্ত তাদের যাবতীয় তাত্ত্বিক

ককচি একটা হাস্যকর উমানিকতা হিসেবে গণ্য হবে। আমাদের এই অগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতির হাত থেকে রেহাই পেতে হবে। আর যতদূর পর্যন্ত এরকম কোন পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা না যাচ্ছে ততদূর পর্যন্ত বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থায় বীরা অসুবিধাজনক অবস্থানে আছে তাদের জন্য সরলশ্রমের প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিতে হবে। এর কারণ, এই নয় যে, তাঁরা বই থেকে শেখার ব্যাপারে অক্ষম, বরং যুগ যুগ ধরে তাদের উদ্দেশ্যোপূর্ণ ও সচেতন ভাবেই দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আর যেহেতু তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল জ্ঞাতপাত ও বর্ণগত কারণেই তাই কেবলমাত্র জ্ঞাতপাত ও বর্ণের ভিত্তিতেই কে দরিদ্র তা চিহ্নিত করা সম্ভব। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন বর্ণ ও জ্ঞাতপাতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে আছে এই সত্যকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যদি করতে হয় তাহলে বিশেষ ধরনের অঙ্কন দরকার।

যেহেতু সম্পত্তি এবং ক্ষমতা অর্জনের জন্য বর্ণবাদ এখনো অন্যতম নির্ধারক তাই ধনী এবং ক্ষমতাবানদের নিজেদের অধিপত্য বজায় ও শক্তিশালী করার জন্য বর্ণবাদ এখনো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। সেই কারণে বঞ্চিত এবং দরিদ্রের মুক্তির সংগ্রামকে সংগঠিত করার জন্য তাদের বর্ণগত পরিচিতিতে ব্যবহার করার নৈতিক অধিকার এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব আছে। শ্রেণী সংগ্রাম এবং বর্ণ সংগ্রাম দুটো পরস্পরবিরোধী বিষয় নয়। বরং ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ এবং একই সীমার ভিতরের সংগ্রাম।

সরলশ্রমের বিরুদ্ধে জেহাদকে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও তার অভাবের নিক থেকে বিচার করাটাকে মূল্যহীন এটা জোর দিয়ে বলা দরকার। সমগ্র বিষয়টাকে সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যাবে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদের মধ্যে। ভারতীয় শাসকশ্রেণী মনে করে অসুভূত একটা বিন্দু পর্যন্ত তারা জনগণের প্রয়োজন মেটাতে পারে। তারা আর সত্যি সত্যিই জাতীয় সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বিকাশে আগ্রহী নয়। তার বদলে, এর বিভিন্ন অংশগুলি কতটা সম্পদ গ্রাস করা যায় তাই নিয়ে ব্যস্ত

আছে। জনগণের বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র মূলত তপসিসী জাতি / উপজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতির অর্ধভূক্ত মানুষদের জন্য কোন কল্যাণমূলক কর্মসূচিও রূপায়িত হয়নি। সম্ভবত ভবিষ্যতেও হবে না। জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া, ন্যূনতম মজুরি, অনুর্বর জমির উন্নয়ন, গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ -এর কোনটাই বিকাশের সুযোগ পায় নি। অন্য দিকে গ্রামীণ সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলো শুধুমাত্র জমির উপর অবৈধ নিয়ন্ত্রণই কার্যকর করেছে, তাই না, দরিদ্রদের জন্য উদ্ভূত যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, যা কিছুটা তাদের জীবনধারণের রসদ যোগাত তাও আত্মসাৎ করছে। অরব্য সম্পদ, মাছ ধরার সুযোগ, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ক্রমজীবি মানুষের হাত থেকে ধনীত্বের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আরোও ভাল সুযোগ সৃষ্টির জন্য গরিবদের দাবিকে আপোষান্বিত হীতি ও নির্মম দমনের সাহায্যে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের আন্দোলনগুলোকে পাশবিক পুঁজিসি অত্যাচার অথবা জঙ্গিদের দ্বন্দ্ববাহিনী দিয়ে মোকাবিলা করা হচ্ছে। নিপীড়িতদের মধ্যেকার উপরের সারির মানুষদের একটা ভাল চাকরি অথবা রাজস্বীতিতে আশে নেওয়ার আকাজককে নস্যাত করতে কুৎসিত অক্রম চালাচ্ছে। বর্তমানে এই ঘটনাই দেখছি। ঠিক যেমন, 'বর্ণগত পরিচিতি' মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নানা ধরনের সেনার ব্যানারে একত্রিত করেছে, ঠিক সেই ভাবেই দরিদ্রদের বিরুদ্ধে এই উচ্চ-বর্গের মধ্যবিত্তদের কেঁপিয়ে তুলতে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বর্ণবাদকেই। এই বর্ণ ও জাতপাত ভিত্তিক জোট বাধাব্যতির বিরুদ্ধে লড়াইও করতে হবে বর্ণ ও জাতপাতের ভিত্তিতে এবং এই লড়াইয়ে কোন রকম আড়ম্বল্য রাখা চলবে না।

২৮

২৯

শ্রেণীসংগ্রাম ও জাতিবর্ণভেদ বিরোধী সংগ্রামের সম্পর্ক প্রব চৌধুরী

যে কোনও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত - সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগের ব্যবস্থা। পুঁজিবাদের অধীনে গণতন্ত্র যে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের বৈষম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তা শোষণ জনগণকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমান অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সে কারণেই সামগ্রিক শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

ভারতের মত দেশে বিখ্যাত আরও জটিল। এখানে দেশীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য শুধু নয়, বৈদেশিক পুঁজির প্রাধান্যকে ধরে না করে আভ্যন্তরীণ বৈষম্যকেও দূর করা সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি যেখানে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে রাখতে পারে তার পিছনে রয়েছে আমের পুঁজিবাদের স্বাধীন বিকাশ না থাকা। আমেরের বৃহৎ পুঁজি নিজেদের পুঁজির জন্য, কারিগরীর জন্য এমন কী বাজারের অংশীদারদের জন্যও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বঁধতে বাধ্য। আবার এদেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাও নানা ক্ষতের মধ্যেও যে টিকে আছে তার পিছনেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ কাজ করে। পুরাতন শ্রমিক উপনিবেশের কালে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্রকে ব্যবহার করতো এদেশে শোষণ ও শাসনের এক শক্ত স্তর হিসাবে। সামন্তবাদী ব্যবস্থা তাদের সস্তা কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের যোগানদার হিসাবে সেবা করে চলাতো। এর মূল কারণ নিহিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণ পদ্ধতির মধ্যে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিগত শ্রমিককে তার শ্রমের মূল্য হিসাবে মজুরি দেওয়ার এক ভাঙ প্রতীতি সৃষ্টি করা হয়। বাস্তবে তাকে দেওয়া হয় শ্রমশক্তির মূল্য। কিন্তু সুকৌশলী অর্থনৈতিক উপায়ে শ্রমের মূল্য এবং শ্রমশক্তির মূল্যের পার্থক্যটি যে শ্রমিকের কাছ থেকে লুপ্ত হতে পারে তা আবৃত থাকে। কিন্তু সামন্ততন্ত্র সমস্ত সমস্ত শ্রমিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে এই অর্থনৈতিক কৌশলের পরিণতি অর্থনীতি বহির্ভূত

২৯

২৯

গীড়নের উপর শোষণ নির্ভর করে। শোষিত শ্রেণীর কাছে তা প্রকটভাবেই উপস্থিত হয়। কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যপ্ত হওয়ার কারণে এবং শোষিত শ্রেণীর উৎপাদনে অংশগ্রহণ এককভাবে হওয়ার ফলে তাদের সংগঠিত হওয়া কঠিন হয় এবং অপরদিকে তা প্রায়ই শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের বদলে শ্রেণী শোষক বা শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে চালিত হয়।

কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই অর্থনীতি বহির্ভূত গীড়নের ব্যবস্থাকে এক সামাজিক ধর্মীয় রীতির অধীনে চালু রাখার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। জাতিবর্ণ-ভেদ ব্যবস্থাটিই হচ্ছে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের এক বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থার মূল কথা হল-বংশানুক্রমিকভাবে নির্দিষ্ট পেশা, অস্ত্রবিবাহ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরস্পর থেকে পৃথক সামাজিকভাবে বিভক্ত এক এক গোষ্ঠী, এক বিরাট জাতিবর্ণকে গড়ে তোলে। সবচেয়ে বড় কথা এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বিভাজনের ভিত্তিতে নয়, অর্থনীতিবহির্ভূত গীড়নের ভিত্তিতে নয়, সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই নিষিদ্ধ জাতিবর্ণের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বংশানুক্রমিক বৃত্তিনির্দিষ্টতা ও সামাজিক বিভাজনের সামাজিক শৃঙ্খলা মেনে চলটিই স্বাভাবিক। অবশ্য বহুবারই নানাভাবে এর বিরোধিতা সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণবাদী এই জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মর্যাদার অনন্যতা, সুস্থিরতা এবং কার্যকারিতাই সেইসব বিরোধিতাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। শাসক পরিবর্তন, শাসকদের ধর্মের পার্থক্যও এমন এক কার্যকর শোষণের ব্যবস্থাতে পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। কেননা, হিন্দু মুসলমান বা খ্রীষ্টান ইংরেজরা সকলেই এই ব্যবস্থাকে ন্যূনতম বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শোষণ চালু রাখার হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর এসবই সুস্থিরতা ও কার্যকারিতা যে শোষণ প্রক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা, এমনকী ধর্মীয় সংস্কার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার মধ্যেই আত্মকৃত হয়েছে। খ্রীষ্টানদের বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থার সংস্কার শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবদের ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের অংশ করে নিয়েছে, বৈষ্ণবদের মধ্যে জাতিবর্ণভেদ রক্ষিত হয়েছে আর পরিবর্তে খ্রীষ্টানত্বকে দেওয়া হয়েছে অবতারণার মর্যাদা। একই ঘটনা ঘটেছে ইসলাম ধর্মের স্যামের নীতির ক্ষেত্রে।

সারা বিশ্বে ইসলামের মধ্যে মতবাদে নানা পার্থক্য। তিব্বত বিরোধের ও পারস্পরিক সংঘর্ষের নানা দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। কিন্তু সেখানে জাতিবর্ণগত বিভেদের কোনও প্রকাশ লক্ষিত হয় না। অথচ ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বৃত্তিনির্দিষ্ট সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আর এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ভারতে ধর্মগুরুত্ব ইসলাম ধর্মীদের অধিকাংশই এসেছিলেন হিন্দুসমাজের দলিত জাতিবর্ণ থেকে, সামাজিক বিভাজনের ফলে নিজেদের দলিত অবস্থান থেকে মুক্তিলাভের অন্যান্যদের সঙ্গে সমমর্যাদার আশায়। কিন্তু তা ঘটে নি। একই জিনিস লক্ষিত হয় খ্রীষ্টানদের মধ্যেও।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে ব্রিটিশ শাসকদের কালে। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রয়োজনে যোগাযোগ-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি রেল পরিবহন, কলকারখানা স্থাপন, ব্রিটেন থেকে শিল্পজাত সামগ্রী এদেশ রপ্তানি ইত্যাদির ফলে পূর্ববর্তী বেশ কিছু পেশা লুপ্ত হয়ে পড়ে বা গুরুত্ব হারায়। পাঞ্জিবহনের যে পেশা কাহারদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তা ব্রিটিশ শাসনকালেই প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় আর বর্তমানে তা সম্পূর্ণভাবেই শেষ হয়ে গেছে। তীতি, কর্মকার, কুস্তকার, চর্মকারদের পেশার ক্ষেত্রেও চরম আঘাত আসে। ইতিপূর্বে মুসলমান শাসকদের আমলে ব্রাহ্মণরা প্রথমদিকে রাজকার্যে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান থাকার কারণে শূত্রদের একাংশ ফার্সি ভাষা শিখে রাজকার্য পরিচালনার সহযোগিতা করতে থাকে। এদের একধরনের সামাজিক উন্নতি ঘটে, পরবর্তীতে ব্রাহ্মণরা এদের উপজাতিবর্ণের অংশ হিসাবে মেনে নিতে থাকেন, এভাবেই বাংলায় কায়স্থ, বৈষ্ণবদের সামাজিক মর্যাদার অবস্থানের উন্নতি ঘটে। বাস্তবে ইংরাজ আমলে পুরাতন বংশানুক্রমিক বৃত্তিনির্দিষ্টতার যে পরিবর্তন ঘটে তাতে শূত্র এবং শূত্রের জাতিবর্ণগুলি পুরাতন বৃত্তি পরিত্যাগে বাধ্য হয়ে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে অবতীর্ণ হন। সেখানেও সুযোগ সীমিত হওয়ায় তাঁরা নানাবরনের শ্রমিকের কাজ নিতে থাকেন। কিন্তু জাতিবর্ণ ব্যবস্থার নিগড় ভেঙে পড়ে না। বংশানুক্রমিক বৃত্তিনির্দিষ্টতায় চিড় ধরে, মুচিরা সকলেই আর চামড়ার কাজ করেন না, কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় যত চর্মকার দেখা

যায় তারা সকলেই মুচি। একইভাবে কর্মকার, কুস্তকাররা সকলে স্ববৃত্তিতে নিয়োজিত নন, কিন্তু গ্রামে গ্রামে যে কর্মকাররা লাঙলের দলা গড়েন বা শান দেন তাঁরা সকলেই কর্মকার, ঢাকা ঘুরিয়ে মাটির হাঁড়ি কলসি আজও যারা বানান তাঁরা কুস্তকার। এর চেয়ে বড় কথা বৃত্তিনির্দিষ্টতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটলেও সামাজিক অবস্থান, অস্ত্রবিবাহ বা সামাজিক সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে না। ফলে একই কারণে কাজ করলেও উচ্চজাতিবর্ণের শ্রমিকদের সঙ্গে তো দূরের কথা হাড়ি, বাগ্গী, বাউড়ী বা ডোমদের মধ্যেও পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কঠোর সামাজিক নিষেধ। প্রকৃতপক্ষে জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থা শুধু শোষক ও শোষিতের মধ্যে নয়, শোষিতদের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি করে। আর এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থাটিকে থাকার সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস।

এক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে শিল্প গড়ে ওঠার প্রথমদিকে উচ্চজাতিবর্ণের দিক থেকে কলকারখানার মজুর হিসাবে কাজে যোগদানে যে অস্বীকার ছিল, কয়েক দশকের মধ্যেই বেকারত্বের ব্যাপকতা সেই অস্বীকারকে ভেঙে দেয়। অন্যদিকে শিল্পে যত উন্নত যন্ত্রপাতির প্রয়োগ হতে থাকে ততই দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হতে থাকে। ফলে চা-বাগানে, খনিতে, নির্মাণকার্যে বা অদক্ষ কায়িক শ্রমিকের ক্ষেত্রে জনজাতি, নিম্ন জাতিবর্ণ, এবং মুসলমানদের সাধারণ শ্রমিক হিসাবে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আর অন্যদিকে দক্ষ শ্রমিকের বা শিল্পের যে সমস্ত ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন কম সেসমস্ত ক্ষেত্রে আগে থেকেই শিক্ষিত উচ্চজাতিবর্ণের শ্রমিকের প্রাধান্য। এভাবে জাতিবর্ণভেদের কঠোরমুকে সংস্কার করে তাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

এমন এক বাস্তব পরিস্থিতিতে ভারতে সাম্রাজ্যবাদীরা বা তাদের অনুচর বৃহৎ পুঁজিপতিবর্ণ, জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। টিকিয়ে রাখার অর্থ অনড়, অটল ভাবে বা বংশানুক্রমিক বৃত্তিনির্দিষ্টতাকে টিকিয়ে রাখা নয়। টিকিয়ে রাখার অর্থ নিজেদের প্রয়োজনমত কইয়ে দেওয়া ও আবার জীবিত রাখার ব্যবস্থা করা। এটি শুধু জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

নয়, সামন্ততন্ত্রের ক্ষেত্রেও তারা এই নীতিই গ্রহণ করে।

স্বভাবতই জাতিবর্ণভেদ সমস্যাটি ওতপ্রোতভাবে রাষ্ট্রীয় শোষণশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। ব্রাহ্মণবাদী মতাদর্শটি বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সাম্রাজ্যবাদ, বৃহৎপুঁজিপতি ও সামন্ততন্ত্রের সেবা করে। এটি নির্দোষিত জাতিবর্ণগুলি যাদের শ্রেণীগত স্বার্থ এই ব্যবস্থার ছায়ায় রক্ষিত হয় তারা খুব ভালভাবেই বোঝে। একটিমাত্র উদাহরণ নিলেই তা স্পষ্ট হবে, হরিয়ানা এবং সংলগ্ন উত্তর প্রদেশে উচ্চজাতিবর্ণ পরিচালিত 'বাগ' পদ্ধতিতেগুলি পৃথক জাতিবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ তো দূরের কথা, সগোত্র বিবাহকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এবং এমন বিবাহের ক্ষেত্রে মর্দানার রক্ষার জন্য হত্যার পক্ষে দাঁড়িয়ে দাবী তুলেছে সাংবিধানিকভাবেই এ বিষয় ব্যবস্থা নিতে হবে। লোকসভা সদস্য ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতি জিন্দালগোষ্ঠীর সদস্য নবীন জিন্দাল, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী সখাওয়াত সকলেই তাকে সমর্থন জানিয়েছে। তাদের যুক্তি এটা ভারতীয় সংস্কৃতি। আর নবীন প্রজন্মের নবীন চিন্তায় মুক্ত হওয়াতে দেশকে আমোদিত করতে উৎসাহী রাজপুত্রটিই হোক, বা কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে পশ্চিমবঙ্গে 'পরিবর্তনের' স্বড় আনতে আগ্রহী হঠাৎ হওয়া হরিচাঁদ ঠাকুরের শিষ্যই হোক কেউই এবিষয়ে একটি শব্দও বের করে নি। পশ্চিমবঙ্গেও এমন 'মর্দাদারকার' জন্য হত্যার ঘটনা বিরল নয়।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক গণতন্ত্রীকরণ ব্যতিরেকে জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আবার ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতন্ত্রীকরণ জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থাকে রেখে নিয়ে বা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে সম্ভব নয়। সত্য সত্যি ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপান্তর চান তাদের যেমন বুঝতে হবে শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে যুক্ত না করলে শ্রেণীসংগ্রামই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামরত শ্রেণীগুলি যদি জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না হন তাহলে এই শ্রেণীগুলির মধ্যকার জাতিবর্ণগত বিভাজন তাঁদের সংগ্রামকে দুর্বল করবে। আবার জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রক্ত শক্তি যতক্ষণ না বুঝবে যে

জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থা শুধুমাত্র উপরিকাঠামো থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের সৃষ্টি বিষয় নয়, এটির মূলে রয়েছে সামাজিক শ্রেণী বিভাজনকে স্থায়িত্ব দানের জন্য শোষণ ও শাসকশ্রেণীগুলির স্বার্থ, ব্রাহ্মণ্যবাদ যার মতাদর্শগত শক্তি জোগাচ্ছে, ততক্ষণ উপর উপর কিছু সংস্কার সাধিত হতেই পারে, দলিত মুখ্যমন্ত্রী, এমন কী প্রধানমন্ত্রীও হতে পারে, কিন্তু জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থাটি থেকেই যাবে।

শেষ বিচারের ঐক্য বলা যায় শ্রেণী সংগ্রাম এবং জাতিবর্ণভেদ বিরোধী সংগ্রামকে পরস্পরের বিপরীত বা সমান্তরাল হিসাবে উপস্থাপিত করাটা সর্বহারার শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার যেমন পরিপন্থী, তেমনই জাতিবর্ণভেদ দূরীকরণের কাজটিরও পরিপন্থী। জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থা বিরোধী সংগ্রামকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করে নেওয়া না হলে বা তাকে সেই কর্মসূচী থেকে পৃথক রাখার প্রয়াস চালালে উভয়ই দুর্বল হবে। শ্রেণীসংগ্রাম এবং জাতিবর্ণভেদ বিরোধী সংগ্রাম পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে বিকশিত হলেই ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর প্রথমেই বলা হয়েছে, প্রকৃত গণতন্ত্র শোষণভিত্তিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে সম্ভব নয়, জাতিবর্ণভেদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তাকে অবশ্যই শোষণভিত্তিক ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত হতে হবে, তা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়। ভারতের বাক্য অবস্থায় বাক্যবিরোধে সামাজিক বিভাজনের ভিত্তিতে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই পদ্ধতি জরুরী। দীর্ঘদিন ধরে একদিকে বামপন্থী মহলের গোঁড়ামিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী অপরদিকে জাতিবর্ণ বিরোধী সংগ্রামের নেতাদের শ্রেণীসংগ্রামবিরোধী মনোভাব দুটি সংগ্রামকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে শাসক শোষকদের সুবিধা করে দিয়েছে। আজ উভয় দিকের অনেকেই সঠিক পদ্ধতির কথা বুঝছেন, প্রয়োজন তাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও জোরদার প্রয়াস।

সৃষ্টিকর্তা যদি সবই সৃষ্টি করিয়া থাকেন
তবে তাহাকে সৃষ্টি করিল কে?

অরজ আলি মাতুকার

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

সাহানা আহমেদ

একশতকের প্রথম দশকের প্রান্তসীমায় পৌঁছেও এ দেশের, বিশেষত এ বাংলার মুসলমানদের ঘরে-বাইরে 'এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা'। প্রায় দেড় শতক আগে এই বাধা ও অন্ধকার যখন আরও দুর্ভেদ্য তখন সে কোন অভয়মন্ত্র তাঁকে এতলা চলার দুসোহস দিল। ঈশিয়ারি ও বিমিনিষেমের হেঁচমুচ উর্ধ্বপদ হয়ে না থেকে নিজের মগজাঙ্গ এবং হৃদয়বেগকে সঞ্চল করে ক্রান্তিহীন আঘাত হানলেন সমাজ ও ধর্মের অচলায়তনে। সহজ সুখের মসৃণ রাজ্য না হেঁটে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলেন অন্ধজনে আলো এবং মৃতজনে প্রাণ সেবার দায়িত্ব। নির্মাণের সেই কঠিন রূতেই আমৃত্যু অটল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

রবীন্দ্রনাথের থেকে উনিশ বছরের ছোট রোকেয়া নিবেদনের পাহারাতে রেখে ঢেকে শৈশব কাটাতে কাটাতে, রাতের অন্ধকারে বড় বোন ও বড় ভাইয়ের কাছে লুকিয়ে চুরিয়ে পড়ে তরল হতে হতে, বহুমুখী সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, জ্ঞানী-গনী ব্যক্তিদের সাহচর্য, সৃজনশীল প্রতিবেশ না পেয়েও বুঝে নিলেন, 'ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব' 'ভারতনারী' জেনে ফেললেন, 'প্রাণীজগতের কোনো জন্তুই', মেয়েদের মতো 'নিরাশ্রয় নহে', উপলব্ধি করলেন, 'এই জীবগুলির জন্য কখনও কাছারও প্রাণ কাঁদে নাই', 'মেয়েরা নিজেগোঁড় জানে এ কথা। কিন্তু ভয়, সংস্কার ও নিরাপত্তার অভাব তাকে সেই সত্য উচ্চারণে বাধা দেয়। রোকেয়া নিজে সেই সত্যকে ভালবেসেছেন এবং নির্ভয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলেছেন। প্রথম থেকেই একটা ব্যাপার তার কাছে পরিষ্কার যে অবরোধ, অশিক্ষা ও অসাম্য কখনোই মেয়েদের অদৃষ্ট হতে পারে না। প্রয়োজন শুধু আপনা মাঝে শক্তি ধরে নিজেকে জয় করার বিশ্বাস। রোকেয়া সেটাই করেছেন। সম্পদে, বিপদে, কঠিন রূতে স্বয়ংসিদ্ধা হয়েছেন

এবং তার সহনাগরিকদেরও উদ্ধৃত্ত করেছেন।

এমন একটা সময়ে রোকেয়া সমাজের মর্যাদাবান অর্ধাঙ্গ হওয়ার দাবী জানান, পুতুল জীবন প্রত্যাখ্যান করে স্বাবলম্বী হতে আহ্বান করেন, মেয়েদের মানুষ হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেন যখন মুসলমান মেয়েরা তো বাটেই, গোটী বাঙালি সমাজের অধিকাংশ মেয়েই অন্তরালবর্তিনী। সমাজে ও সাহিত্যে তাদের শুধু গৃহিনী ভূমিকারই জয়জয়কার। অল্প বয়স থেকেই সুস্বাদু পঞ্চবাঞ্ছনে তৃপ্ত করে পুরুষের হুলেয়ে পৌছবার পাঠ নেন। তাঁদের সাংসারী রূপের দৃষ্টিতে মুগ্ধ সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং তাঁরা নিজেরাও। রোকেয়া অপ্রিয় সত্যভাষণে জানান ওই আভরণ আসলেই মেয়েদের শৃঙ্খল। সুখী গৃহকোণের বাইরে এক বিপুল জগৎ তার অপরিমেয় সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ হবার অপেক্ষায় রয়েছে। বিবাহ তার নিরাপত্তা তো নয়ই, একমাত্র গন্তব্য নয়। সুলতানার স্বপ্নে ধরা দেয় এমন এক ভূত্বর্গ সেখানে মেয়েরা সঙ্কোচ ও বিহুলতার কাছি ছিঁড়ে ফেলে বাইরে কাজের জগতে দাপিয়ে বেড়ান। তারিনীভবনের মেয়েরা ('পদ্মরাগ') নিজেরদের ভাগ্য বিপর্যয়ে বিলাপ করে সময় ও নিজের অপব্যয় ঘটান না। তাঁরা জানেন ও মানেন 'স্বামীর খর-করাই নারী জীবনের একমাত্র সার নহে'। প্রগতিশীল হিন্দু-ব্রাহ্ম পরিবারগুলিতেও যখন নারী শিক্ষার ধরণ ও নারীর আর্থিক স্বাবলম্বন নিয়ে ছন্দু-সংশয় এমন কি আপত্তিও থাকছে রোকেয়া তখন কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য পুরুষের সমান পারিশ্রমিকের পক্ষে সওয়াল করেছেন। কিন্তু এখানেই থামেন না। আরও যা বলেন তা তাঁর সমকালে বৈষম্যিক - "যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রমের দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারি না?" ('স্বীজাতির অবনতি' মতিচূর, ১ম খণ্ড)

নিজের সমাজের নিশিচ্ছন্ন অন্ধকারের স্বরূপ নিজের জীবন দিয়ে জেনেছেন রোকেয়া। মুসলমান মেয়েদের জীবনে সতীদাহের আগুন নেই, বিধবার জন্য নিষ্ঠুর নির্জলা, নিরন্ন একাদশী নেই, কৌলিন্য প্রথার হাঁড়িকাঠ নেই। তবু যে সে খোলা হাওয়া লাগাতে পারে না তার পালে তার কারণ তাকে চোখ রাজার তিন তালুক, অবরোধে সে অস্তরীন, অশিক্ষার অন্ধরূপে তার পোকামাকড়ের

ঘরবসতি। তাই রোকেয়া বারবার মেয়েদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হতে বলেন। শিক্ষা ও আর্থিক স্বনির্ভরতাই দেয় নিজস্ব পরিচিতি এবং আত্মমর্যাদা। চিন্তায় চেতনায় নিজ সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা রোকেয়া মেয়েদের মনে করিয়ে দেন সুস্থ দাম্পত্যেরও ভিত্তি শিক্ষা এবং স্বনির্ভরতা। আবার সমাজ ও দেশ নির্মাণেও যে মেয়েদের ইতিবাচক দায় ও দায়বদ্ধতা আছে সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রোকেয়া উপদেশ - বাণী দেন না। বরং তুলনায় ভেঙ্গে, ককুটিতে ভয় না পেয়ে ঝড়ের সঙ্গে মিতালি করে যে দিশার সন্ধান পেলেন স্বজাতির সামনে তাই তুলে ধরলেন।

আজীবন ধর্মীয় আচরণ পালন করে এবং পর্দার অন্তরালে থেকেও রোকেয়া নিবির্ঘায বলেন সমস্ত ধর্মগ্রন্থ 'পুরুষ রচিত বিধিব্যবস্থা'। রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে জন্ম, বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও প্রগতিশীল ভক্তি গদগদ আনুগত্যে তিনি আত্মনিবেদিত নন। ভজ্ঞন, আরাধন সম্পর্কে তাঁর হিরণ্ময় নীরবতা। তাঁর দেখালেবিত্তেও কোথাও শাস্ত্রের রেফারেন্স নেই। এতটাই ধর্ম বিষয়ে তিনি উপসর্গীন। বরং যে বিধি বিধান মেয়েদের এবং মানবিকতার পরিপন্থী তার সাথে সংগ্রামের জন্য ঘরে ঘরে প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত করতে তিনি একদিকে কুল তৈরী করে মুসলমান মেয়েদের অন্তরমহলে জ্ঞানের আলো ছালাতে চাইলেন। অন্যদিকে আত্মমান-ই-খাওয়াতিনে-ইসলাম সংগঠন গড়ে তাদের পাশে দাঁড়ালেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁর অসমাপ্ত লেখাটিতেও মুসলমান মেয়েদের বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত অসম্মত হওয়ার অধিকার সন্ধান করেছেন। এ সবই 'একা'র প্রয়াস। শিকড় গেঁড়ে বসা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। ব্যক্তি পুরুষের প্রতি তাঁর অসূয়া নেই। ব্যক্তিগত জীবনে দু'জন পুরুষের কাছ থেকেই পেয়েছেন স্রোতের বিপরীত স্রোতার দেওয়ার প্রশ্রয় - বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের এবং স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা সবসময় মনে রেখেছেন।

সার্ব শতবর্ষ বয়সী রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কিছু কিছু ভাবনার সঙ্গে রোকেয়ার জীবন ও কয়েকটি ভাবনার আশ্চর্য সমাপতন ঘটেছে। সন্তান-বিয়োগ,

প্রিয়জনের মৃত্যু, প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং সমালোচনার ছদ্মবেশে তীর নিন্দা এই দু'জনের আপনাবোধে চলার গতি রোধ করতে পারে নি। দুজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ, নিরলস, একগ্রন্থিত। রবীন্দ্রনাথের আশা ও বিনোদিনী (চোখের বালি) প্রেমের ও বিবাহের মোহছিন্ন করেছে আত্মমর্যাদার প্রসঙ্গে। দামিনী (চতুর্দশ) সমস্ত শরীর মন দিয়ে অধীকার করেছে প্রথমে স্বামীর এবং তারপরে স্বামীর গুরু লীলানন্দ স্বামীর চাপিয়ে দেওয়া জীবনযাপনের নকশা। তারও পরে কুমুদিনী বলে এমন কিছু আছে যা সন্তানের জন্যও ছাড়া যায় না। ১৮৮০-১৯৩২ অবধি নাতিদীর্ঘ জীবনকালে রোকেয়া এ সবই হৃদয়ের গভীরে অনুভব করেন এবং বারবার বলেন মেয়েদেরই নিজের হাতে খুলতে হবে নিজদের সমস্ত বেড়ি, সে চোখ মেললেই জ্বলে উঠবে আলো। নারীর মুক্তির সঙ্গে শরীরের অসংযত চাহিদার শয্যায় বারবার পুরুষ সঙ্গী পরিবর্তনের যথেষ্টাচারকে এক করে দেখবার যে একটি শ্রবণতা রয়েছে রোকেয়া সেই চলতি হাওয়ার পক্ষী নন। সেও তো পুরুষতন্ত্রেরই ফাঁদ। কোনোরকম কাজলিপনাতাই আত্মা নেই রোকেয়ার, রোকেয়ার আবেদন নারীর বুদ্ধি, মেধা ও মনের কাছে।

ঠিক এই কারণেই রোকেয়ার কথা ও কাজ চিরকালীন। তথ্য ও পরিসংখ্যানের জটিল বীধায় না জড়িয়েও আমরা জানি সব মেয়েদের জন্য এবং বিশেষত মুসলমান মেয়েদের জন্য অর্পণ এখনো অব্যাহত নয়। জুল ছুট, অপরিণত বয়সে বিয়ে, সতীনকাটা এবং ধর্মের পোহাই দিয়ে পর্দার আড়াল তাদের মেয়েই করে রাখে, মানুষ হতে দেয় না। 'হোমমেকার' নামে একটা গ্যালভরা শব্দ চালু হলেও গৃহবধূদের অধিকাংশেরই গুরুত্ব সংসারে ভাজা কুলের বেশি নয়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে। বুদ্ধির দীপ্তি এবং মননের জ্যোতির থেকে তার কাছে অনেক বেশি প্রত্যাশিত রত্নমপটুতা এবং গৃহকর্মপূর্ণতা। এই জায়গা থেকেই রোকেয়া মেয়েদের ঘরের সঙ্গে সঙ্গে বাইরেরও সহস্রবিধ কর্মতৎপরতায় সমান স্বচ্ছন্দ দেখতে চান। ব্যক্তিগত জীবনে এবং লেখালেখিতে তিনি তাই সর্বদা গঠনমূলক। তাঁর কথা ও কাজ একে অন্যের পরিপূরক। যশ নয়, অর্থ নয়, খ্যাতি নয়, প্রতিপত্তি নয়, তাঁর জীবনের পরম

লক্ষ্য এমন আত্মসচেতন উন্নতশির নারী গড়ে তোলা যে নিজের চোখ দিয়ে দেখে, নিজের কান দিয়ে শোনে এবং নিজের মন দিয়ে চিন্তা করে।

কণ : আবদুল মান্নান সৈয়দ, সুদক্ষিণা খোব, মোরশেদ শকিউল হাসান, বুলবুল আহমেদ।

যে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে, সে মহামুখ
যে ঈশ্বরের প্রচার করে সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড
যে ঈশ্বরের পূজা করে, সে অসভ্য।

- পেরিয়ার রামস্বামী নাইকার

ইহা নিশ্চিত যে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়াই আমাদের
দেশের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করা যাইতে পারে।

- রাফল সাংকৃত্যায়ল



পুরুষ লিঙ্গ দর্শন এবং প্রশ্ন তুমি কি মুসলিম? গুজরটি, ২০০২

জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চালাকী

গুরুপ্রসাদ কর

জাতি-বর্ণ নিয়ে সাধারণ স্তরে কোন আলোচনা উঠলে সে বামপন্থীই হোক আর দক্ষিণপন্থীই হোক আমাদের রাজ্যের ভদ্রলোকশ্রেণির কাছ থেকে যে কথাগুলি শোনা যায় তা হচ্ছে এইরকম -

এই ধরনের প্রথা সব জায়গাতেই ছিল, কোন দেশে তা দুর্বল হয়েছে আবার কোন দেশে তা হয়নি।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এর প্রভাব থাকলেও আমাদের রাজ্যে তা প্রায় নেই বললেই চলে।

চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে জাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে সংরক্ষণ থাকলে তাতে যেমন জাতিভেদ বাড়তেমনি দক্ষতা বা মেধাকে কাজে লাগানো যায় না।

সংরক্ষণ যদি থাকতেই হয় তা হলে আর্থিক ক্ষমতার ভিত্তিতে করা উচিত।

আসলে উপরের এই প্রতিটি বক্তব্যই পরম্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং তা আসলে সমাজে বর্তমান অবস্থায় জাতিপ্রথা যেভাবে টিকে আছে তাকে বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করে। আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদ সেই প্রাচীনকাল থেকেই জাতিভেদ প্রথার পক্ষে সমাজের মতামত গড়ে দিয়ে আসছে এবং ব্রিটিশ ভারতে তা ঔপনিবেশিক শাসকদের সাথে মৈত্রী গড়ে আরোও পরিশীলিত হয়ে আজও সেই একই কাজ করে চলেছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এই ধরনের জ্ঞানচর্চা থেকে প্রথমে যে বিষয়টি বোঝা দরকার তা হচ্ছে সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব, ধনী ও গবীরের

মধ্যে ভেদাভেদ ইত্যাদি বিষয়গুলির আবির্ভাব সর্বজনীন, সমাজ বিকাশের একটি ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই তার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু শ্রেণিব্যবস্থা বলতেই জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা বোঝায় না। ভারতীয় অঞ্চলে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে একটি শ্রেণি ব্যবস্থা হিসাবেই দেখা দিয়েছিল এবং এখনও শ্রেণি ব্যবস্থার সাথে তা গভীরভাবে সম্পর্কিত, কিন্তু শ্রেণি ব্যবস্থার অর্থ জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিতে শ্রেণি ব্যবস্থা নিশ্চয়ই রয়েছে এবং সাম্যবাদী সমাজ গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তা থাকবেও, কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে সেখানে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা বজায় রয়েছে। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা ভারতীয় অঞ্চলে ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত একটি বিশেষ শ্রেণি ব্যবস্থা।

ভারতীয় অঞ্চলে ঐতিহাসিকভাবে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাটি শ্রেণি ব্যবস্থা হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল। ইতিহাসে দীর্ঘ পর্বে জুড়ে এই ব্যবস্থার জটিল বিকাশের আলোচনাকে বাদ দিয়ে সাধারণভাবে বলা যায় যে এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার অবস্থান কোথায় হবে তা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় তার অবস্থান দিয়ে অর্থাৎ শেষ বিচারে তার জন্ম দিয়ে নির্ধারিত হতো। এই ব্যবস্থায় মূলগতভাবে উচ্চবর্ণের মানুষের হাতেই ছিল সামাজিক উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ, তাদেরই ছিল সমাজের মানসিক শ্রমের উপর একচেটিয়া অধিকার এবং তার ফলে তারা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় নিজে অবস্থানকারী মানুষের তৈরী উদ্ভূত ভোগ করতো। আবার নিম্নবর্ণে অবস্থানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটির মধ্যে পেশার ভিত্তিতে বহু জাতি (caste)-র উদ্ভব হয়। এই মৌলিক সমাজ কঠোরভাবে মজবুত করবার জন্য অস্পৃশ্যতা, বিভিন্ন জাতি-বর্ণের মানুষের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি সামাজিক নিয়ম কানুন যেমন হাজির করা হয়েছিল তেমনি কর্মফলসহ আরোও নানারকম প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিকেও সামনে আনা হয়েছিল। যদিও সমাজের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ধ্রুপদ ফলে এই ব্যবস্থা চিরকাল একরকম থাকে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে ভারতীয় অঞ্চলে এই জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা অর্থনীতি বহির্ভূতভাবে উদ্ভূত আদায়ের ব্যবস্থা তথা সামন্ত ব্যবস্থাকে আপেক্ষিকভাবে অধিকন্তর শক্তিশালী রূপ দান

করেছিল।

চিরায়তভাবে সমস্ত শ্রেণী সমাজে শোষণ ও শোষিত এবং মানসিক ও কার্যিক শ্রমের বিভাজন থাকলেও ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় অঞ্চলে এই বিভাজন হয়েছে জাতি বর্ণের ভিত্তিতে। একসময় জমিদার ও প্রজাকৃষকদের চেনা যেতো জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান দিয়ে। উচ্চবর্ণ তথা ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষের লাভল না ধরাটা এরই সাংস্কৃতিক প্রতিফলন। একইভাবে সেই প্রাচীনকাল থেকেই নিম্নবর্ণের মানুষেরা দৈহিক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন যেখানে রাজ্য শাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানসিক কাজের একচেটিয়া অধিকার ছিল উচ্চবর্ণের হাতে। এটা যে দীর্ঘদিন ধরে বজায় থাকতে পেরেছে তার কারণ জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় মানুষের কাজ ঠিক হয়েছে জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় তার অবস্থান দিয়ে তথা তার জন্ম পরিচয় দিয়ে, কর্মগত যোগ্যতা দিয়ে নয়। আর এর ফলে ভারতীয় সমাজে উৎপাদন বিকাশের গতি সেভাবে সম্ভারিত হতে পারে নি, গ্রাম সমাজের স্থিতিশীলতা একটি আপেক্ষিক শক্তি অর্জন করেছে, আর তার ফলে পণ্য উৎপাদন ও তার মধ্যে দিয়ে বুজেরিয়া উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ সেভাবে গতি অর্জন করতে পারেনি।

ব্রিটিশরা শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অর্থনীতিতে অনেক ধরনের পরিবর্তন সত্ত্বেও জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার কঠোরমোগত দিকটির বিশেষ কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। বরং ব্রিটিশ শাসকেরা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করে উচ্চবর্ণের মধ্যে এমন একটি নতুন জমিদারশ্রেণী, ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সরকারী আমলা ও কর্মচারীসহ একটি মধ্যবিত্তশ্রেণী তৈরী করতে সক্ষম হয় যারা নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম বিশেষকণ্ড কৃষক সংগ্রামের বিরোধিতা করে ব্রিটিশের পক্ষ নেয়। অপরদিকে নিম্নবর্ণের মানুষেরা মূলগতভাবে গ্রামে প্রজাকৃষক, ক্ষেতমজুর আর শহরে কল-কারখানার কার্যিক শ্রমিক হিসাবে বা শহরের অববর্জন পরিম্বারের কর্মী ইত্যাদি পেশাগুলিতেই আবদ্ধ থাকে। নানারকম পরিবর্তনের ফলে জাতি ব্যবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত পেশার ক্ষেত্রে হয়তো কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষের ক্ষেত্রে

তা ঘটেছে এক ধরনের কার্যিক শ্রম থেকে আর এক ধরনের কার্যিক শ্রমে। যেমন কোথাও জেলেরা উচ্ছেদ হয়ে মাছ ধরার পেশা ছেড়ে কৃষকে পরিণত হয়েছে, কোথাও দলিত আদিবাসী মানুষ চা বাগানের জমিকে পরিণত হয়েছে ইত্যাদি। তবে ব্রিটিশ আমল থেকেই শহরে কাজ করার সুবাদে নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যেও ছোট ও দুর্বল হলেও একটি মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা পরবর্তীতে শিক্ষা, সরকারী চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশের দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই সংগ্রামের ফলেই সংরক্ষণের মতো কিছু প্রথা চালু হয়েছে।

ভারতবর্ষে যে শ্রেণী ব্যবস্থা ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থা একে অপরের সাথে জড়িয়ে রয়েছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি বাওয়ার লক্ষ্যে আমূল ভূমি সংস্কারই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ কার্যকরী হলে একদিকে যেমন জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তি অনেকটাই দুর্বল হবে তেমনি উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক স্ববিরতা কাটতে থাকবে। কিন্তু এর পাশাপাশি এই বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে আরোও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা এরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক, প্রশাসনিক পদ সহ সমাজের মানসিক শ্রমের বিভিন্ন পেশাতে যদি নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থিতি না হয় তা হলে ভারতীয় সমাজের গণতান্ত্রিকীকরণ ঘটতে পারবে না।

আমাদের রাজ্যের বাম শাসকেরা অনেকদিন ধরে সংরক্ষণের প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে কেবল ভূমি সংস্কারের কথা তুলে ধরতো। ভূমি সংস্কারকে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে কেবলমাত্র বর্ণা রেকর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে গত তিন দশকের এরা আমূল ভূমি সংস্কারের বিষয়টিই তুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। আর এই রাজ্যে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নানান রকম ব্রাহ্মণ্যবাদী হল চাতুরী করে অনুসূচিত জাতি ও উপজাতির অধিকারেই কেবল বন্ডিত করেনি, গত শতকের শেষভাগে কেন্দ্রীয় সরকার মন্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে 'অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি'র জন্য কিছু সংরক্ষণ কার্যকরী করার কথা ঘোষণা করলে

আমাদের রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে এই রাজ্যে 'অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি'র অস্তিত্ব নেই। 'অনুসূচিত জাতি' ও 'অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি' বলে কোন সামাজিক গোষ্ঠী থাকে না, সামাজিকভাবে কেবল বিভিন্ন জাতি (Caste)-র অস্তিত্ব থাকে। সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানারকম মানদণ্ডের ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির কিছু অংশকে এভাবে চিহ্নিত করে। মন্ডল কমিশন এরকমই কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে কিছু জাতিকে 'অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি' হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধার সুপারিশ করে। অবশ্য এইসব বিষয় ও মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট পড়ে বোঝার মত যোগ্যতা তাদের ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমানে আবার তারই উত্তরসূরী ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকেরা আওয়াজ তুলেছে যে কলেজ ও স্কুলের সংরক্ষিত শিক্ষকপদে এস.টি./এস.টি.-র মধ্যে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। আর তার ফলে বহু পদ সংরক্ষণের আওতার বাইরে আনা হয়েছে। কেন পাওয়া যাচ্ছে না? হয় এই ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রশাসকেরা মিথ্যা কথা বলছেন আর না হলে বলতে হয় এই রাজ্যে নিম্নবর্ণের মানুষকে এতটাই পিছিয়ে রাখা হয়েছে যে তাদের শিক্ষক হবার মত যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে না। আর এই দুটিই যদি সত্যি না হয় তাহলে বলতে হয় যে নিম্নবর্ণের মানুষেরা প্রকৃতিগতভাবেই অযোগ্য যা আসলে খাটি মনুবাদ।

জাতি-বর্ণ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার বিষয়টিকে তুলিয়ে দেওয়াটা আরেকটি ব্রাহ্মণ্যবাদী কৌশল যা আমাদের রাজ্যের শাসকেরা ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার কাঠামোটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো জন্মের ভিত্তিতে কর্ম নির্ধারণ। পুরানো সময়ে এটা ছিল অহিন আর বর্তমানে অহিন ছাড়াই এই কাঠামোটি মূলগতভাবে টিকে আছে। অস্পৃশ্যতা হচ্ছে এই ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উপরিকাঠামোগত বিষয়। পাক্ষী জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার কাঠামোটিকে অক্ষুন্ন রেখে অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করতেন যা আসলে প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলার এই অঞ্চলে প্রথমত ঐতিহাসিকভাবে অস্পৃশ্যতা প্রথা দুর্বল ছিল এবং পরবর্তীতে শক্তিশালী বাম শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের ফলে এই প্রথা

আরোও দুর্বল হয়। কিন্তু তাতে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এখনকার শাসকেরা সুচতুরভাবে অস্পৃশ্যতার প্রথটিকে সামনে রেখে বোঝাতে চায় যে এখানে জাতি-বর্ণ প্রথা দুর্বল। কিন্তু বাস্তবত আরোও সুচতুরভাবে অবহেলার জন্য এখানে মানসিক শ্রমের কর্মক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতিনিধিত্ব অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় কম।

বর্তমান অবস্থার এ কথা বলা যাবে না যে উচ্চবর্ণের মানুষ মানেই শোষক আর নিম্নবর্ণের মানুষ মানেই শোষিত আর তার ফলে শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতি-বর্ণ সংগ্রাম সমার্থক। গ্রামাঞ্চলে জমির মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে তাদের ৯০ শতাংশ উচ্চবর্ণের হলেও তাদের মধ্যে গরীব কৃষক, মধ্য কৃষক রয়েছে। একইভাবে ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ৯০ শতাংশ মানুষ নিম্নবর্ণের হওয়া সত্ত্বেও তাদের একটি অংশ আজ গ্রামাঞ্চলে শোষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে মানসিক শ্রমের বিভিন্ন পেশাগুলিতে যুক্ত উচ্চবর্ণের মানুষ মাত্রই শোষক নয়, তারাও নানাভাবে বিশ্ব একচেটিয়া পুঁজির শোষণের শিকার, যদিও একথাও সত্যি যে তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাদী মতাদর্শ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। ফলে আমাদের বোঝা দরকার যে বর্তমান অবস্থায় জাতি-বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজন মানেই যেমন শ্রেণী বিভাজন নয় তেমনি শ্রেণী ব্যবস্থার সাথে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার এক গভীর আন্তঃসম্পর্কও বজায় রয়েছে। আর তাই এখানে শ্রেণী সংগ্রাম এবং নিম্নবর্ণের মানুষের জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আন্তঃসম্পর্কিত হয়ে থাকবে এবং একে অপরকে প্রভাবিত করবে।

সংবিধানকে দেশের গণ দেবতার মন্দির হিসাবে তৈরী করা হয়েছিল, কিন্তু গণদেবতা আসীন হওয়ার আগেই মন্দিরের বেদীটি শরতানরা দখল করে নিয়েছে। আজ আমাদের প্রধান কাজ হবে এই সংবিধানকে অবিলম্বে ভঙ্গীভূত করা।

- আবেদনকার

ভারতে জাতপাত :

মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিকৃষ্টতম অপরাধ

দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস

মার্কসবাদের অন্যতম প্রবক্তা এঙ্গেলস বলেছেন, যা কিছু বাস্তব, তাই যুক্তি সম্মত (All That real is rational) Ludwig Feuerbach গ্রন্থে। কিন্তু একথাটা প্রথমে বলেছিলেন ভাববাদী দ্বন্দ্বিক চিন্তা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক জার্মান দার্শনিক গিওর্গ ভিলহেলম ফ্রিডরিখ হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel), তবে আরো একটু সংযোজন সহ। তিনি বলেছিলেন: All That is real is rational and all that is rational is real. এই মন্তব্য প্রসঙ্গে এঙ্গেলস এর ব্যাখ্যা হলো এই, যে এ বাক্যের প্রথমার্শই হলো হেগেলীয় দর্শনের বৈপ্লবিক দিক। কেননা যুক্তিসম্মত হলেই কোন কিছুকে সর্বদা বাস্তবে পাওয়া যায় না। প্রশ্ন হলো ভারতে আজ আযৌক্তিক হয়ে যাওয়া অথচ টিকে থাকা জাত-পাতের সৃষ্টির যৌক্তিকতা কী ছিল? জাতপাত নান্দ মানুষে মানুষে এই সাংস্কৃতিক বিভাজন একই জনগোষ্ঠী মধ্যে কোন যুক্তিতে বা প্রমাণে পোষা? এবং আজও কেন তা টিকে আছে?

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস মানব সমাজের ইতিহাস প্রসঙ্গে যে মৌলিক কথাটি বলেছেন তা হলো : The history of existing society is the history of class struggles (Manifesto of the Communist Party)। বুজোয়া ও সর্বহারার ঐতিহাসিক আবির্ভাব প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস এই মন্তব্য করেন। অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যেই সব সমাজের ইতিহাস বর্তমান। তাই ভারতীয় সমাজের মার্কস কথিত বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজন-জাত জাতপাতের ইতিহাস ও বর্তমান আছে ঐ শ্রেণি সংগ্রামের

ইতিহাসের মধ্যে।

এই শ্রেণি সংগ্রামে বিজয়ী শ্রেণি তার সুবিধাকে স্থায়ী নিতে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজকে তাদের স্বার্থের পক্ষে নির্দিষ্ট রীতি-নীতি ও নিয়মের নিগড়ে বেঁধে ফেলে। ভারতে জাত-ব্যবস্থা হলো এসেদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধা ভোগীদের উদ্ভাবন, যার প্রাথমিক রূপটি হলো বর্ণ-ব্যবস্থা। বর্ণ-ব্যবস্থাও হলো শ্রম-বিভাজনের প্রাথমিক পর্যায়ের জাত-ব্যবস্থা। কালক্রমে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে শ্রমের মধ্যেই বিভাজন সৃষ্টি হয়। ফলে বর্ণ-ব্যবস্থার উত্তরাধিকার থেকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পক্ষে বিভিন্ন শ্রমের অর্থাৎ পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষকে বংশানুক্রমিক পেশাভিত্তিক পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। লক্ষ করার যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রথম যে দুই বর্ণ রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করত তাদের শ্রমের কোন বিভাজন ঘটেনি, কিন্তু বিভাজন ঘটেছে সম্পদ সৃষ্টির ও বস্তুনের সংগে যুক্ত অন্য দুইবর্ণের শ্রম বা পেশার। ফলে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক জন বিভাজনের দার্শনিক অবস্থান থেকে শ্রমের সংগে যুক্ত বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের শ্রমবিভাজন ভিত্তিক অর্থাৎ পেশাভিত্তিক জৈবিক জীবন প্রক্রিয়ার সংগে যুক্ত মানুষদের পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একটি বর্ণ থেকে আসা মানুষদের বিভিন্ন পেশাভিত্তিক পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস থেকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র মানুষকে আবার বিভাজিত করার ব্যক্তবতা পেয়ে যায় এবং শ্রমজীবী মানুষের অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্রের বিভাজন ঘটানো হয় তাদের নানা পেশাকে ভিত্তি করে। পেশাভিত্তিক এই পরিচয় হলো মানুষের 'জাত' পরিচয়। তাই কলা যায় মূল চার বর্ণের দুই বর্ণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। প্রাথমিক পর্যায়ে 'বর্ণ' পরিচয় রক্ষা করতে পারলেও বৈশ্য ও শূদ্র তাদের 'বর্ণ' পরিচয় হারিয়ে শ্রমের সংগে যুক্ত পেশাগত নানা জাত-পরিচয় দ্বারা চিহ্নিত হন।

এখন প্রশ্ন হলো ভারতে যখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধা ভোগী অংশ (বর্ণ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং পরবর্তীকালে জাত ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য ইত্যাদিরা) তাদের সুবিধা ধরে রাখতে শ্রমজীবীদের উপর স্থায়ী পেশাভিত্তিক জাত পরিচয় চাপিয়ে দিয়ে সেই পরিচয়কে দৈবানুমোদিত বলে চালাতে সক্ষম

হলেন তখন পৃথিবীর অন্যদেশে একই পদ্ধতি অনুসৃত হলো না কেন?

অন্যদেশে শ্রেণিব্যবস্থা বর্ণ বা জাত ব্যবস্থার স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করতে না পারার কারণ এই, যে সেসব দেশের জনগোষ্ঠী বিভাজন করা সম্ভব ছিল না। ভারতে নানা সময়ে নানা নরগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে। এইসব নরগোষ্ঠীর মধ্যে খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রাথমিক পর্যায়ে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংঘর্ষ ঘটেছে। কিন্তু ঐ অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই সংঘর্ষ থেকে আপসও করতে হয়েছে। এবং এই আপসের প্রক্রিয়া চলেছে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর নিকট বিজিতদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে, যে আত্মসমর্পণ একদিকে তাদের আর্থ-ক্ষমতাকে দুর্বল করেছে, অন্যদিকে সামাজিক মর্যাদায় অবনমিত করেছে। ক্ষমতাবানেরা অবনতদের অবনমিত অবস্থা মেনে নেওয়ার জন্য, প্রথমদিকে নিশ্চয়ই বল প্রয়োগের নীতিই গ্রহণ করেছিল, কিন্তু যেহেতু এই বল প্রয়োগ এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, তাই যান্ত্রিক নিয়মানুসারে তার বিরুদ্ধেও ছিল সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া। অতএব ক্ষমতাবান শ্রেণির দার্শনিকদের এই প্রতিক্রিয়া প্রশমনের উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। এই প্রয়োজন থেকেই মানুষকে তার বর্তমান অবস্থা মেনে নেওয়ার জন্য এসেদের ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ সমাজের বিভিন্ন শ্রমের মানুষের জন্মের এক সাধারণ 'উৎস' আবিষ্কার করেন। এই উৎস হল ব্রহ্মা। সামাজিক অবস্থান ও ক্ষমতাকে প্রতিফলিত দেখা যায় ব্রহ্মার দেহ থেকে বিভিন্ন বর্ণের জন্ম স্থান উল্লিখে : *The Purusosukta hymn occurs in a late section of the Rgveda and describes the sacrifice of the god Prajapati, from whose body the four varnas are said to have sprang, the brahmyanas from his mouth, the ksatriyas from his arms the vaisyas from his thighs and the sudras from his feet. The symbolism of each bodily part relates to the ritual status and function of the particular varna* (Romila Thapar, *Interpreting Early India*, P 141)

বস্তুত একই দেহাংশ হিসেবে এই বাণী সকল অংশের নিকট পৌঁছান যে তারা সহোদর, আবার বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন ক্রিয়ার একান্ত নিজস্ব ভূমিকা আছে যা অপরিবর্তনীয়। অতএব সকলকে প্রত্যেকের নিজ নিজ বর্ণের করণীয় কার্য

করতে হবে। সেটাই বিধি নির্ধারিত, ঠিক যেভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশ তাদের নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনা করে। জ্ঞাত হল অপরিবর্তনীয়। ব্রাহ্মণ দার্শনিকের বর্ণ ও জ্ঞাত-দর্শন এতই শক্তিশালী যে, তা একদিকে যেমন শ্রেণি সংগ্রামকে সৃষ্টির বিধান বহির্ভূত করে দেয় তেমনি অপরদিকে মানুষকে অন্যাবধি এই কৃত্রিম বিশ্বাসে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে, যে মানুষ জন্মসূত্রেই পরস্পর থেকে ভিন্ন। এই একবিংশ শতাব্দীতে যখন বর্ণ ও জ্ঞাত ব্যবস্থা আমাদের পুঁজিতাত্ত্বিক উৎপাদনব্যবস্থার কলে পড়ে বিধ্বস্ত, তখনও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দুধর্মের মানুষেরা চেতনায় তিনহাজার বৎসরাধিক কালের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন।

বলা হয় সংস্কৃতির জন্ম হয় মানুষের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়া থেকে। এরূপ সিদ্ধান্ত সঠিক হলে ভারত থেকে বহুপূর্বেই জ্ঞাতপাত নির্মূল হওয়ার কথা। প্রশ্ন হলো, কী ভাবে এই জ্ঞাতপাত পুঁজিতাত্ত্বিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিবদ্ধ ভারতীয় জীবনে আজও বেঁচে আছে? এ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে এই, যে ভারতে একদিকে যেমন সামন্ততন্ত্রকে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে উৎখাত করে পুঁজিতন্ত্র আসেনি, তেমনি ভারতের শাসক শ্রেণি ও তার রাজনৈতিক দল সমূহের কথাকথিত বামদলগুলি সমেত, নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধা প্রাপ্ত জ্ঞাতগুলি-ভুক্ত মানুষের অধীন এবং এরা চান না বলেই, পুঁজিতন্ত্রের উপযোগী সংস্কৃতি গড়ে উঠছে না এদেশে। এরা চান না বলেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির সব উপাদান ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। ইতিহাসের নিকট অতীতকাল হতেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের টিকে থাকার রহস্য এইখানে।

উপসংহার :

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যে-দর্শন দ্বারা এদেশের মানুষকে মার্কস কথিত বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজনের সংগে শৃঙ্খলিত করেছে, মানব সভ্যতার সৌভাগ্য, যে এমন দর্শন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। তেমন

ক্ষেত্রে মানুষের সভ্যতা অকথ্যরিতভাবে বৈপ্লবিক যুগেই প্রভুত্বমুখিত হয়ে যেতো। আমাদের দেশের তথাকথিত মহাপুরুষ এবং এই বাংলার তথাকথিত পূর্নজাগরণের মহান মানুষদের চোখে এই মানব সভ্যতা বিরোধী তন্ত্রটিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি (অথবা হয়ত তাদের শ্রেণিস্বার্থে এ বিষয়ে তারা চোখ বুজে থাকেছেন)। একমাত্র ব্যতিক্রম, সম্ভবত, বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যিনি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, যে এই ধর্ম অতি নিকৃষ্ট মানের ধর্ম যা মানবতা বিরোধী।

শ্রেণিসংগ্রাম কথাটা শুনে অনেকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মনে রাখতে হবে এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রই শ্রেণি সংগ্রামকে ত্ত্বন করতে সফল হওয়ার পৃথিবীর অন্যতম আদিম সভ্যতার দেশ অন্যাবধি তার মানবিক জীবন প্রক্রিয়ার সহায়ক উপাদানের জন্য ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে হাত পেতে থাকে। মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের সামাজিক অগ্রগমনের প্রক্ষেপে এদেশের জ্ঞাত-পাতকে মার্কস বলেছেন, 'চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক'। এদেশীয় মার্কসবাদীরা এই চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক সম্পর্কে উদাসীন থেকে মানুষকে সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। ডি.ডি কোসাধি গণিতবিদ পুরাতাত্ত্বিক একেই বলেছেন হিন্দু ঘিচারিতা।

বিদ্যা, বিচার শক্তি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অর্জনের
স্বার্থ সকলের সমান নয়, কিন্তু জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা শ্রেণী
অনুসারে কোন তারতম্য হয় না এমন পরিবেশ এবং
সুযোগ হলে সকলশ্রেণীর লোকই তুল্য স্বার্থ
দেখতে পারে।

- রাজশেখর বসু



উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দলিত মহিলাদের জমায়েত - পশ্চা, ওড়িশা ২০০৮

চীনের নেতারা তাঁদের নতুন সংবিধানে
ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং নাস্তিক্যবাদ
প্রচারের স্বাধীনতা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
ধর্মকে স্বাধীনভাবে বিচারের অবকাশ স্বাধীন
মননশীলতা বিকাশের পথ। হিন্দুধর্মে মানুষের
স্বাধীন চিন্তার কোন অবকাশ নেই।

- আন্দোলকর

ধনিক শ্রেণী তাদের অপরিমিত ধনলিপ্সা
ও সাম্যহীন ঔদ্ধত্যের দ্বারা এই পৃথিবীর
মেহনতি মানুষের পক্ষে এক অশ্রুসিক্ত
বিবাদময় প্রান্তর পরিণত করে রেখেছে।

- আন্দোলকর

নান্দীকার থেকে বস্তার - দ্বিধামুক্ত মাধবীদের সেকাল একাল

পাচু রায়

‘হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি - / আত্মহত্যে মন কেন গেল
ঠেকি / বাতাসে লুকায়ে থেকে কে যে তোরে গেছে ডেকে, / পাতায় পাতায়
তোরে পত্র সে যে গেছে লেখি।’

২৪ নভেম্বর, ২০০৭। পানগোড়ি গ্রামের ১৫ বছরের কিশোরী মাধবী
বামনকে খুন করেছিল সাপোয়া জুতুম। ৩ ডিসেম্বর ২০০৭। কোরেনজোড়
গ্রামের মাধবী বুদরামও খুন হয়েছিল একই ভাবে। ছত্তিশগড়ের দাঁতেওয়াড়ায়
অভিনার বাইরে যেতে কোনো দ্বিধা ছিল না এই দুই মাধবীর। অত্যাচারের
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ডাক এসেছিল দলিতকারণের বাতাস থেকে, কেন্দুপাতার
লেখা ছিল সে পত্র রক্তের আখরে। দলিতকারণ বা গভোয়ানালাভকে বীভৎস
ভারতবাসীর আশ্রিত ভয়াল ভয়ংকর বহুজাতিক সৃষ্টনের হাত থেকে বাঁচাবার
এক অসম্ভবের গান তাঁরা শোনাচ্ছেন, সেই আদিবাসী ‘সাবঅলটর্নি’ মানব
মানবীদের পবিত্র রক্তের আখরে। ছত্তিশগড়ে। পুরানোর যবতির পুত্রী মাধবীরও
কোনো দ্বিধা ছিল না। কোনো পত্রে বা কোনো বাতাসে ভর করে আসেনি
কোনো ডাক। অসম্ভব পথের আহ্বান সে শুনেছিল তাঁরই অন্তরাঙ্কার। মাধবীর
এই পৌরানিক উপাখ্যান গাইছেন নান্দীকার প্রবল পরিশ্রমে, পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে।
এই কলকাতায়।

অরুণ্ধতী রায় লিখেছেন তাঁর ২৯ মার্চ outlook নিবন্ধে walking with
comrades এ। ভারত বা ওড়িশা জন্মাবার আগে থেকে ভোমরিয়াকোন্ড
উপজাতি ওড়িশার নিয়মগিরি পাহাড়ে বাস করেছে। বোম্বো কোম্পানী ওড়িশার
এ পাহাড়টায় লুট করার আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। ঐ পাহাড়ে যে
বরাহিট আছে তার মূল্য এখন আন্তর্জাতিক বাজারে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার।
ভারতবর্ষের GDP র অন্তত তিনগুণ। এক সম্ভ্রান্ত অধিকৃতের পাশে বসে
থাকা এক বৃদ্ধা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ‘দাদালোক’দের বিরুদ্ধে এক গান গাইতে

শুরু করল। উনি একজন মাসিয়া, যাদের মধ্যে নিয়ম ছিল বিয়ের পর মেয়েদের উদ্ধার অনাবৃত রাখার। এটাই ছিল মহিলাদের প্রথম ইস্যু যা পার্টি হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করেছিল যৎপরনাস্তি যাত্রা। ১৯৮৬ সালে এরা গড়ে তুলেছিল মহিলা সংগঠন। এরা আদিবাসীদের মধ্যে বাচ্চা অবস্থায় মেয়েদের বিয়ে, ফুসলানো, রজাসলাদের গ্রামের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট বুড়োবরে থাকার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, ছেলের বর্ষবিবাহ, পারিবারিক নির্যাতন ইত্যাদি নানান কুপ্রথা বিগ্রহে লড়াই লাগু করে। সব ব্যাপারে যে এরা জয়ী তা নয়, কেন নারীবাদী আন্দোলনই বা তেমনটা করতে পেরেছে! যেমন এখনও দন্ডকারণ্যে মেয়েদের বীজ পুত্রে দেওয়া হয় না। সত্যই এই অন্যায় কুপ্রথা রদ করার ব্যাপারটা পুরষরা মেনে নিলেও বাস্তব জীবনে তারা এটা করতে দেয় না। তাই পার্টি টিক করে, 'জনতানা সরকার' এর হাতে যে জমি আছে সেখানেই বীজ বুনে চাষ করবে মেয়েরা। এই জমিতেই মেয়েরা আল দিয়ে বীজ বোনে, সবজি ফসল। অর্ধেক জয়, সম্পূর্ণ নয়। অরুন্ধতী লিখে চলেছেন, 'কমরেড সুশীলা শোনাচ্ছেনগঠনো মেয়েদের ওপর 'সজ্জনমকারী সালোয়া জুভুমের কথা, যাদের শ্লোগানই ছিল আমরা দুটো বউ আনবই আনব! KAMS এর সদস্যদের ওপর ওরা অব্যাহত ধর্ষণ আর নির্যাতন চালিয়েছে। কমরেড রিঙ্কির ছোট ছোট চুল যাতে ওরা বাসে বব-কটি। যেটা ওদের কাছে খুব সম্মানের। কারণ বব-কটি মানেই 'মাওইউট'। আর পুলিশের কাছে নারী বব-কটি হলেই কোনো কথা নেই - ধর আর গুলি করে মার! নাগা ব্যাটেলিয়ান এবং সালোয়া জুভুমরা কমরেড রিঙ্কির গ্রাম 'গেপার্মা' আক্রমণ করল ২০০৫ এ। গ্রামটা জ্বালিয়ে দেওয়ার পর লুণ্ঠি আর নুড়িতে তুলে নিয়ে ঘাসের ওপর ফেলে গণধর্ষণের পর খুন করে ওরা। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া পর ওখানে একটা ঘাসও অবশিষ্ট ছিল না। বলেছিল রিঙ্কি। আর আসেন না নাগা ব্যাটেলিয়ান। কিন্তু নিয়মিত আসে পুলিশ। মহিলা আর মেরগের সংস্পর্শে পড়লে আসে। "অজিতারও বব-কটি চুল। ওর গ্রাম কোরসীলে সালোয়া জুভুমরা এসে নালায় চুবিয়ে ওপনকে মেরে ফেলেছিল। দূর থেকে ঘটনা দেখে চলেছিল অজিতা যখন ও ছিল গ্রামীণ মিসিশিয়ায়। ও দেখেছিল ওজন নারীকে ধর্ষণের দৃশ্য। তারপর গলায় গুলি করে মেরেছিল ধর্ষণকারী একজনকে। লম্বা বিনুনির

সুন্দরী লম্বী আমাকে বলল, আমি দেখেছি জুভুম আমাদের গ্রাম জোরের ৩০ টা বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। তখন আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, আমরা কিছু করতে পারিনি, অসহায় চোখে দেখেছি শুধু। সুমিত্রা বলেছিল, আমাদের গ্রামে মেয়েদের গাছে চড়তে দেওয়া হয় না, যদি চড়ে তবে তাকে ৫০০ টাকা বা একটা মুরগী জরিমানা দিতে হয়। মারের বদলা নিতে কোনো ছেলেকে যদি কোনো মেয়ে মারে তবে তার জরিমানা একটা ছাগল। ছেলেরা শিকারে যায় মাসের পর মাস ধরে, মেয়েদের যেতে দেওয়া হয় না। ভাল মাংসটা পাবে ছেলেরা খারাপটা মেয়েরা। মেয়েদের ডিম খেতে দেওয়া হয় না। এর জন্যই (PLGA) তে যোগ দেওয়া? ঘটনার ইতিহাস তুলে ধরার পর প্রশ্ন তুলেছেন অরুন্ধতী রায়।

এই সাব অল্টার্ন 'মাধবী' রা যখন লড়াইে অন্ধ্রপ্রদেশ ছত্তিশগড় ওড়িশা ঝাড়খন্ড মহারাষ্ট্র বিহার পশ্চিমবঙ্গে, তখন পিতৃসত্য পালন বা পিতার মহাত্ম্যাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বা ঘটনাচক্রে পুরুষ হয়ে যাওয়া গালপের পৌরবলালিত অহমিকার ব্যপারে বলি প্রদত্ত পুরানোর কোন রাজা যথার্থির একমাত্র কন্যা মাধবীর কাহিনী এখন কেন মঞ্চে আনলেন নান্দীকার? উত্তরে নান্দীকার বলতে চেয়েছেন, মেয়েদের ওপর অত্যাচার আবহমান - সেই মাধবী থেকে এই মাধবী বিরামহীন। অরণ্যে পাহাড়ে যে কারণে মাধবীরা বন্দুক তুলে নিয়েছে কাঁধে, কলকাতায় নাটকে যে কথা বলতে চেয়েছেন নান্দীকার মাধবীর মাধ্যমে, সে কথার অনুবাদ নিজের জীবনে মর্মে মর্মে অনুভব করে মাধবীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন বা যারা করেন না তাঁরা তাঁদের জীবনের রোজনামচারণ। মাধবী নামভূমিকায় পুত্ৰী শোহিনী আর পরিচালনায় মাতা স্বাভীলেকা জীবনের অভিজ্ঞতায় - সামাজিক অভিজ্ঞতায় আন্তরিক।

সরাসরি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে অবিরোধী পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মাধবীদের লড়াই আবহমান। জেনি মার্কস থেকে রোজা লুক্রেমবার্গ হয়ে কল্লুরবা গান্ধীকে হুয়ে এখানকার কমল বসু - সকলেই আসলে মাধবীই। সেই মাধবীদশা কাটাতে এখানে এখন ভয়ংকর এক লড়াইয়ে সামিল সকলে।



দলিত সমাজের সার্থী আত্মজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন
চিকিৎসক বিনায়ক সেনের মুক্তি চাই

এ আর্থাবর্ত আমার দেশ নয়

প্রেরণা রায় সেনগুপ্ত

আমি এই ধর্মনিরপেক্ষতার মডেল দেশটির এক নাগরিক। যদিও ছোটবেলার স্মৃতিতে আবছা মনে পড়ে ১৯৯২ এর ৬ই ডিসেম্বর। টেনশান, কার্ফিউ আরও কত কি। তখন মানে বুঝিনি। ভালোই লেগেছিল, মা বাবা সবাই বাড়িতে টানা অনেকদিন। আজ বুঝি, 'ধর্মশ্রেষ্ঠ' হিন্দুর অভিযানে বাবরি মসজিদ মাটিতে মিশে যাওয়ায় ভালো লাগার কিছু ছিল না। তারপর থেকে বয়স বাড়তে বারবার শুনেছি মুসলমানরা ভালো হয় না। মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর, রাজবাড়ীতে নাকি আমরা সুরক্ষিত নই। যেন হিন্দুরা ধর্মন, মীলতাহানীর খারবায় মড়ায় না। বেস্ত বেকারী, কেওনজুড় - স্বাক্ষরমাপের মুসলিম-দলিত স্বীকৃতিদের ওপর ধর্মনগুলিকে Love making বলবেন? এক সুপারহিট সিনেমা, গমর এক প্রেম কথায়, দেখেছিলাম পাটিশানের সময় লাহোর থেকে হিন্দুদের নিয়ে আসার সময় ট্রেন ভর্তি মৃতদেহ এল। আর এক মুসলমান রমনীকে পাকিস্তান পৌঁছে দিল এক শিখ। সে আবার প্রোগানও দিল - "হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ।" অপারেশন বুস্তার বোধ হয়, দুঃস্বপ্নই ছিল। সত্যি শিখরাও হিন্দুস্থানকে ভালোবাসে। হিন্দুস্থানই বটে, না হলে কি হিন্দুমাতে দিনক্ষণ মেনে ইনস্যাটি আকাশে ওঠে (আবার পড়েও যায়)? নাকি এই হিন্দুমাতেই নারকেল ফাটিয়ে সরকারী অনুষ্ঠান শুরু হয়? ধর্মনিরপেক্ষতার মিথোটা গত ৬০ বছর ধরে বলতে বলতে ভারত রাষ্ট্র (নাকি হিন্দুস্থান) একটি মিথে পরিণত হয়ে গেছে।

সংবিধানের প্রজ্ঞাবনার অনেক কিছু বলা আছে। স্বাধীন সার্বভৌম-ধর্মনিরপেক্ষ (পরে আবার সমাজতান্ত্রিক কথাটাও ঢোকানো হয়েছিল)। আমার অভিজ্ঞতায় সবকিছুই মিথো। সবচেয়ে বড় মিথোটা হল এই ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি। এটা হিন্দুর দেশ, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের দেশ। বাবরি মসজিদ

ভাঙা ইতিহাসকে ধ্বংসকারী ওজরাট-কেওনগড়-কান্দামালে গনহত্যাকারী-গণধ্বংসকারী এই ব্রাহ্মণ্যবাদ আমার কাছে ক্যাসিবাদের নামান্তর। যারা নিজের ধর্মের মতোই সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমান অধিকার ও মর্যাদা না দিয়ে দলিতের জন্ম দিয়েছে তারা অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাবে? এদের ক্যাসিবাদী বলব না তো কি বলব?

এমন একটি সেশে অরক্ষিত রায়-গিলানীরা তো ভুল করেছেন কাশ্মীর এই দেশের অংশ নয় বলে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মানচিত্রে তো পাকিস্তান আফগানিস্তান সবই হিন্দুস্থান। কাশ্মীর তো কোন ছার। ইতিহাস বলে কাশ্মীরের রাজা ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের মাঝে থাকতে চেয়েছিলেন বটেই জনগণের কথাকে পাত্তা না দিয়ে এ দেশে অর্জকৃষ্টি। নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদে গণভেটি ভালো ব্যাপার, কাশ্মীরে নয়। ইতিহাস তো বাবরের কথাই মানে, রামের নয়, তাও অযোধ্যায় রামলালা বিরাজমান। রাম নাকি অবতার, তার অমুস্থান নির্ণয় বরেন্দ্র নন্দর মানুষের এলাহাবাদ আদালত।

যারা ঐ রায় দিয়েছেন, আর যারা দিল্লী থেকে স্বাধবপুর হয়ে গুসকরা অবধি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে তারাও জানে ইতিহাস কি আর গড় কোনটা। আসলে উগ্র জাতিয়তাবাদ ক্যাসিবাদেরই জন্ম দেয়। নাৎসীরাও থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ, সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী। ওখানে রাইখস্টাগ পুড়েছিল, এখানে সরকারি ভবন প্রেস।

ব্রাহ্মণ্যবাদের পেশি আত্মপালন হল আজাদ কাশ্মীরের বিরোধীতায় উগ্র জাতিয়তাবাদী শ্লোগান। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তানের থেকে স্বাধীনতা চাওয়ায় ভারত সমর্থন করে। আজ কাশ্মীরি জনগণ যেটাই চাওয়ায় অন্য নীতি। কাশ্মীরের আজাদীর বাধা হিসেবে আন্তর্জাতিক কসাকৌশল যাই হোক না কেন, তাকে চ্যাম্পিয়ন করার এজেন্সি কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদেরই মনোপসি।

আজাদ কাশ্মীরের সমর্থক অরক্ষিত রায় ২ বছর আগে কাশ্মীরে আসেন। উপস্থিত থাকাকালীন লেখা এক প্রবন্ধে বলেন যে ওখানে একটি পোষ্টার ঢাক

কিছুটা কষ্টই দিয়েছিল, সেটিতে লেখা ছিল "জান সে পেয়ারা পাকিস্তান নাঙ্গা ভুখা হিন্দুস্থান"। আমার কষ্ট হয় না, কারণ হিন্দুস্থান আমার দেশ নয় এই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পরাক্ত করে দলিত সংখ্যালঘুরাই আমার নতুন দেশকে তৈরি করবে।

অনেকে এ রাজ্যকে ধর্মনিরপেক্ষ বর্ণশোষণহীন বলে ভাবেন। যদিও সে ভাবনা রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুর পর কিছুটা খালি খোঁজেছে। মনে করিয়ে দিতে চাই বোধহয় সবচেয়ে বড় দলিত গণহত্যা ও অমানবিক উচ্ছেদের স্বাক্ষর এই রাজ্যই বহন করছে। মরিচ ঝাঁপি ভুলে যাননি তো?

মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে

সুশান্ত সরকার

একজন মানুষ

উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে

জনপদ থেকে বহুদূরে একা

আকাশের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে

আকাশকে ছুঁতে চাইলো।

সে পারলো না।

আর একজন মানুষ

এই জনপদের মাঝে দাঁড়িয়ে

হাজার লাখ কোটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে

মানুষের কাগা ঘাম রক্ত

মানুষের হাসি আনন্দ

মানুষের সাক্ষ্য বিপর্যয়কে সাধী করে

আকাশের দিকে হাত বাড়ালো

কি আশ্চর্য

সে সূর্যকে স্পর্শ করতে পারলো।

অক্টোবর ২০১০

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

জীবন বয়ে চলে অস্ত্রহীন
রাত্রি শেষ হলো, ফুরোলো দিন
স্বপ্ন শেষ হ'লে যুদ্ধ শেষ
ভয় পড়ে থাকে আমার দেশ।

স্বপ্ন শিকড়ের তিতিক্ষায়
শরীর মন শুধু জুড়িয়ে যায়
স্বপ্ন বয়ে চলে অস্ত্রহীন
ফুরোয় ভালবাসা ফুরোলো দিন

নিবেছে সব আলো, মধ্যরাত
আকাশে টান জ্বলো, টানের হাতি
তফাৎ হলে শুধু অস্ত্রহীন
জীবন বয়ে চলে রাত্রি দিন।

জীবন ফুরোবেনা এই আশায়
মৃত্যু ভেঙে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়
আকাশে স্বেত পাখি সাদা নিশান
বাজার মুক্তির গণবিদ্যান।

সস্তা কাগজের ভীড়ে আমি
পুঞ্জের প্রান্তায় হতগামী
দীর্ঘ ক্রান্ত যান মহাপ্রলয়
প্রভুত উবেগে ভরা সময়।

তবু যে কোণে থাকে অস্ত্রহীন
জীবন ও মৃত্যুর প্রতিটি দিন
স্বপ্ন ফুরোলো না যুদ্ধ শেষ
ভয় পড়ে থাকে আমার দেশ।।

মনুর আইন

বলাই রায়

রাখাল শুধু গরুর সাথে
দেখা যাবে মাঠে
পড়তে কি তার সাথ যায় না
মন বাসে না পাঠে?
এক সমাজে দুটি ধারা
চলছে চমৎকার
সাবালক না হোতে রাখাল
ধরছে দুখের হাল
টেনে বোকা কাঁধটা বাঁকা
হচ্ছে সে নাকাল
শিশুশ্রমিক তরে আইন
গাল ভরা সব কথা
নিভলো কি তার বিদের আগুন
ঘুচলো কি তার ব্যথা?
নিরক্ষর সব বয়স্কদের
করাবে কালিদাস
কলমপেখা বাবু বলে - “আমরা
কাঁটবো ঘোড়ার খাস”?
মনুর আইন চলছে আজও
শূন্যের অশ্রু পায়ে
নাক ঘুরিয়ে ধরছে কান
হাত না দিয়ে গায়ে
ধনবাদের সমাজ ধারা
কভু ফেরেনা হাল
জলে ভরা নদীর পাশে
যেমন পচা খাল।

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমাজবিদ্যাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব কর্ণবহু, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমীকরণের এক ওরুদ্বপূর্ণ উপাদান। ভারতে আর্য অনুপ্রবেশের পরপরই এই ভূখণ্ডে কর্ণবহুর আগমন। সেই সময় হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র বা পুরাণে হিন্দু কথাটিরই উল্লেখ নেই, অসলে আজকের হিন্দুধর্ম হল প্রাচীন ভারতের আর্থধর্ম। আর্থধর্মের নেতা, ব্রাহ্মণরা ও ক্ষত্রিয়রা এদেশে ইসলাম ধর্মের আগমনের সময়ই হিন্দুধর্ম কথাটিকে গ্রহণ করে। ইসলাম গভাবকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যই এই আপাত ঐক্যের আবহাটির দরকার ছিল। তারপর থেকে নানা বিবর্তনের পরও সামান্য অক্ষবল করে আজও হিন্দুধর্মের কর্ণবহু অটুটই রয়ে গেছে। আমরা যদি পিছনের দিকে তাকাই তা হলে সেখানে পাব মূলত, ব্রাহ্মণদের হাতেই আগাগোড়া সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতাও সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি। এর সাথে সমানভাবে না হলেও ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছে ক্ষত্রিয়রা, মূলত বণিক, বৈশ্যরাও ধীরে ধীরে এসেদের সহকারীত্ব পরিণত হয়, যদিও বৈশ্যদের একটি ছোটো অংশ ক্ষমতাহীন শ্রমজীবির মধ্যেও ঢুকে যায়। অমির মালিকানা থেকে ফসল উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির ওপর মালিকানাও ছিল মূলত ব্রাহ্মণ ও তার সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের হাতে। কর্ণবহুর সাক্ষাৎে ক্ষত্রি ব্রাহ্মণদের, তারপর বহুক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের স্থান। সবর নীচে ছিল শূদ্রদের অবস্থান। ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক কার্যনির্বাহ করত, সেনাবাহিনীর উচ্চপদেও তারাি আসীন ছিল, ধীরে ধীরে বৈশ্যরাও ক্ষমতার কাছাকাছি উঠে আসে, তাদের বণিকবৃত্তির জন্য হাতে টাকা সঞ্চিত হবার সাথে সাথেই। শূদ্ররা সবাই ছিল শ্রমজীবী। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার ছিটকেটাও তাদের ছিল না। অর্থনৈতিক ভাবে তারা ছিল সবাই নিম্নবিত্ত। বৈশ্যদের একটি ছোট অংশ ছিল নিম্নবিত্ত। বাকি বৈশ্যরা এবং ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়রা সবাই উচ্চবিত্ত। কালক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের একটা অংশ ধীরে ধীরে মধ্যবিত্তে পরিণত হতে থাকে। সাংখ্যার নিক দিয়ে বিজ্ঞ সমাজের একটা নুষ্টিমের আংশই হলো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও উচ্চবিত্ত বৈশ্যরা। এখানে একটা ব্যাপ্যারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার, হিন্দু ধর্মে মানুষ অন্য ধর্মের মতো সমানাবিকার পায় নি, এক ধর্মবিশ্বাস মানুষদের মাঝেও বিভাজন রাখেছে, সেটা অন্য কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না। কর্ণবহু আসলে পেশাগত পরিচয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আসলে হিন্দুধর্মের এই বর্ণাশ্রম কোনোভাবেই ধর্মীয় অনুশাসন বিচক্ষণ ও কুটিল পদ্ধতি। বিধি ইতিহাসে যে কারণে আমরা বারবার উচ্চবিত্তের বিরুদ্ধে নিম্নবিত্তের যে সংঘর্ষ দেখেছি এদেশে বারবারই তা এসেছে বর্ণাশ্রমের মোড়কে।

কর্ণবহুর বিরুদ্ধে বারবারই শূত্র ও নিম্নবিত্ত বৈশ্যরা সংগ্রামে নেমেছে। এই অবস্থার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও নেমেছে। তারই মধ্যে ছিল শ্রমীয় উদারতার দাবী। আবার ছিল ধর্মাস্ত্রকরণের পথে ইটিও। ধর্মাস্ত্রকরণ কখনোই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় নি। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার কাছেও নিয়ে আসেনি। কিন্তু বৌদ্ধ জৈন- ইসলাম বা খ্রীষ্টান ধর্মের (অনেক পরে) উদারতা ও সমানাবিকারের ধারণা তাদের কাছে টেনে নেয়। উচ্চবর্ণের অবহেলা সহ্য না করতে পেরে এটা ছিল কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দুর এক একান্তই সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ।

মুঘল শাসনের সময়টিকে বাদ দিলে আমরা বুঝতে পারব এ ভূখণ্ডে শোষণের মাধ্যমে একই থেকে গেছে। মুঘল শাসনের সময়টিকে বিচ্ছিন্ন করেই তাই দেখতে হবে। বৃষ্টি অগ্রাসনের মাধ্যমেই বর্ণবিকল পতন হয় মুঘল শাসনের, তারপর থেকেই কর্ণবহুর পুনর্বহাল হওয়া শুরু, কারণ সাম্রাজ্যবাদী যুক্তিরা একে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে।

বৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রবেশ করার আগেই গড়ে উঠেছিল শিল্প

উদ্যোগ মূলতঃ ব্রাহ্মণ - ক্ষত্রিয় এবং কিছু বৈশ্যের হাত ধরেই। বৃটিশরা সেই স্বাধীন শিল্পবিকাশের পথকে রুদ্ধ করল নিজের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও নিজেদের দেশে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির বাজার তৈরির জন্য। স্বাভাবিকভাবেই এদেশের স্বাধীন শিল্পটিকে থাকলে বৃটিশের উৎপন্ন মাল বিক্রির পরিধি অনেক কমে যেত এদেশে। এক্ষেত্রেও বৃটিশরা পাশে পেল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বানিজ্যিক পুঁজি হাতে থাকা অধিকাংশ বৈশ্যকে। মধ্যবিত্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাও বৃটিশের সাথেই হাত মেলালো। এই হাত মেলানোর একমাত্র কারণ ছিল যদিও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ তখন বৃটিশের হাতে, তবুও ক্ষমতাকে প্রয়োগ করছিল তারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দেরই মাধ্যমে, এরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এজেন্ট। সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দন্ড এদের হাত ধরেই ঘুরতে লাগল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেমন বৃটিশদের লুণ্ঠনকে তীব্র করে, তেমনই পুনর্বহাল করে বর্ণব্যবস্থাকেও, বর্ণব্যবস্থারনির্ভর শোষণে এরপর যুক্ত হয়েছে উগ্র হিন্দুত্বের প্রগা স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেস থেকে অস্থিযুগ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই উগ্র হিন্দুত্বের প্রভাব। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে রাষ্ট্রবিন্দন থেকে অস্থিযুগের আন্দোলনকারীদের গীতা নিয়ে অ্যাকশন, তালীর পূজা করাই হোক বা বন্দোবস্তের মর্মান, এসব তারই প্রমাণ। এ সবের জন্যই মুসলমানরা দূরেই থেকেছে আন্দোলনের থেকে। ভগৎ সিং / H.S.R.A কে আন্দোলনের ময়দানে দেখার আগে পর্যন্ত কোনো মুসলমানের সক্রিয় উপস্থিতির কথা জানাই যায় না। একদিকে বর্ণগত বৈষম্য ও শোষণ, ও অন্যদিকে উগ্র হিন্দুত্বের প্রোচন, যার ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও দূরে থেকেছে, 'এর সাথে দূরে থেকেছে সংখ্যালঘুরাও আন্দোলন থেকে। এরই আবার এ দেশের শ্রমজীবী অংশ, সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা যায়, তা ছিল আসলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাত ধরে আসা এক উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতীয়তাবাদ কারণ ভারতীয় জাতীয়তা বলে কখনোই কোনো কিছু গড়ে ওঠেনি। বৃটিশ শাসনের আগে ভারত রাষ্ট্রের কোনো কাঠামোই ছিল না। মৌর্য, গুপ্ত, খিলজি বা মুঘল শাসনাবধিও যে অংশটি ছিল তার সাথে আজকের ভারত রাষ্ট্রের কোনো মিল নেই। ছিল কিছু সামন্তরাজ্যের অধীনে একাধিক স্বত্ত্বাধী, যে রাজনৈতিক

আন্দোলন ও স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে ভারত একটি জাতিরাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারত সেটিরও পথ রুদ্ধ করে বৃটিশ, ফলে যে আন্দোলন ১৮৫৭ এর পরে গড়ে ওঠে সেটির প্রেরণা ছিল বর্ণহিন্দু শাসনকে প্রত্যক্ষভাবে ফিরিয়ে আনার। যদিও অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু এতে সহমত ছিলেন না কারণ তখন তাঁদের সাথে বৃটিশের আপোষের সম্পর্ক একদিকে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব থেকে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে না থাকার ধারণা তৈরি হয়, আবার অন্যদিকে বহুগুণের বর্ণহিন্দু অহংকার, ফলে বিদেশীদের বিরুদ্ধে এই লড়াইতে তাঁরা নিম্নবর্ণ - সংখ্যালঘুদের পাশে ডাকেননি। এর সাথে ছিল ইউরোপীয় শিক্ষা নিয়ে নাক শিটিকোনা ঈশ্বর গুপ্তদের প্রভাব। এসবের ফলেই দলিত সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটা থাকেনি ঐ সময়ের আন্দোলনে। এদের জোট কিন্তু দেখা গেছিল ছল-উলগুলান-মীলবিল্লাহ-পাবনা কৃষক বিদ্রোহের সময়। কারণ সেই সময় আন্দোলনের নেতৃত্বে বর্ণহিন্দুরা ছিল না। বরং তারা তখন এর বিরোধীতাই করেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে প্রবেশ করার পর সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তি এগিয়েছে। পাল্লা দিয়ে পাশ্টেছে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চরিত্র ফলে কাঁচামালকে প্রসেস করে দেবার জন্য দরকার পড়ল কিছু দালাল শিল্পপতি। যারা স্বাধীন শিল্পবিকাশের পথে হাঁটবে না। বরং উৎপাদন করবে বৃটিশের স্বার্থে। টাটা আখানী বিড়লার জন্ম সেই কারণেই। ভারতের শাসনক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে জুড়ে যায় এই দালাল শিল্পপতিরাও।

১৯৪৭ সালে ভারতে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ শাসন শেষ হবার পরে শুরু হয় একাধিক সাম্রাজ্যবাদী দেশের পরোক্ষ শাসন। এবং বর্ণব্যবস্থাকে ব্রাহ্মণ্যবাদ চিকিয়ে রাখে, কিছু সেকটি ভালভু দিয়ে কিন্তু এর পেছনে বৈষম্য রয়ে যায় একইরকম ভাবে। S.C-S.T তালিকায় অনেক কম জনজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, বাকিদের ফেলা হয় O.B.C এর আওতায়। ধর্মনিরপেক্ষতার ঘুরো তুলে প্রবল বৈষম্য ও শোষণের শিকার সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত রাখা হয় সংরক্ষণের আওতায় না নিয়ে এসে, S.C-S.T-O.B.C সংরক্ষণ দেওয়া হয় প্রয়োজনের

তুলনায় অনেক কম। জেনারেল হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যাদের, সেই উচ্চবর্গের হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩। প্রচলিত সংরক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এক ক্রিমি লেয়ার, যাদের একাংশ ব্রাহ্মণ্যবাদের দালালে পরিণত এবং যারা দলিতদের ক্ষোভকে সেফটি ভালভ দিয়ে থাকে।

সময়ের সাথে সাথে সামাজ্যবাদের প্রয়োজন পড়লো আরো প্রসেসড কাঁচামাল। ফলে জরুরী হয়ে দাঁড়াল আরো কারখানা স্থাপন ও ক্রত পরিবহনের জন্য রাস্তাঘাট। ফলে এবার শুরু হল কৃষিজমিতে কারখানা স্থাপনের চেষ্টা। পাহাড় জঙ্গলে মাটির তলায় থাকা খনিজের দিকেও চোখ পড়ল দালাল শিল্পপতিদের। ফলে শুরু হল জমি দখল, পাহাড়, জঙ্গল দখল। দালাল শিল্পপতি ও স্থানীয় ভূস্বামীরা সবাই ব্রাহ্মণ্যবাদী। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের শোষণ চরিত্র একইভাবে বহমান থেকে গেল। সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাসও থেকে গেল একই। এই দেশকে লুণ্ঠন করতে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও দালাল্যবাদ মিলিত হলো এক মহাজোটে।

শেষ কথা হিসাবে বলা দরকার যে সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরস্তর সংগ্রাম ব্যতিরেকে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার মুক্তি সম্ভব নয়। কারণ রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য অনুযায়ী যাকে নিপীড়িত শ্রেণী বলা হয়, তা এদেশে সংখ্যালঘু বা দলিত হিসেবেই নির্যাসে চেনে। ফলে সামাজিক সামোর আন্দোলন ছাড়া এদেশে তথাকথিত শ্রেণী সংগ্রাম সফল হতে পারে না। আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার, সাম্র-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পরিসর ইউরোপের মতো না হলেও এদেশে বহুদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্র ধরা আছে। তাই সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেও সামাজিক সামোর লড়াইকেও সহায়তা করা যায়।

একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রচলিত কিছু কথা

অনন্ত আচার্য

প্রঃ আপনার কথায় সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু শব্দগুলি বারবার এসেছে, মুসলমানদের জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে আমরা তো কিছুদিনের মধ্যেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হবো। এ বিষয়ে আপনি নীরব কেন?

উঃ সেগাস কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ভারতে মুসলমানদের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হিন্দুদের তুলনায় ০৩ শতাংশ বেশী। আপনার আশংকাজনক অবস্থায় পৌছতে আমাদের আরও ২৮৩০ বছর অপেক্ষা করতে হবে অবশ্য যদি হিন্দুরা “দো ইয়া তিন বাস” কর্মসূচীকে মানা করে। হিন্দুরা যদি নিঃসন্তান থাকে তবে এ সময় কমতে পারে। আসলে পরিবার পরিকল্পনার ভাবনা সরকারী স্তরে বা বেসরকারী স্তরে এসেছে ৫ এর দশকে শেষ প্রান্তে। ৪৭ এ ব্রিটিশ চলে যাবার পর নতুন ভারত গঠনের স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে বেশী সময় লাগেনি। ভারত সরকার জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে অন্যতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে। আমার আগে বলা ২৮৩০ বছরের বিষয়ে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বা সংখ্যাতত্ত্বের ছাত্রর কাছ থেকে জেনে নিশ্চিত হয়ে যেতে পারেন। সূত্র : সেগাস বিভাগ, অ্যাট্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট।

প্রঃ মুসলমানরা কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বিরোধী এবং পরিবার পরিকল্পনাকে ওদের ধর্ম বিরোধী মনে করে।

উঃ কেবলমাত্র মুসলমানরাও যদি এরকম ভাবতেন তবে মুসলিম প্রধান রাজ্য (যেমন- উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল) গুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বিহারের তুলনায় বেশী হয়ে যেতো। ইসলাম ধর্মে যেমন বলা হয়েছে নারীসেহ কৃষিক্ষেত্রের মতো অবাধ কর্তন করা হোক তেমনি আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে পরিবার পরিকল্পনার প্রাথমিক পদ্ধতি ফরজল (Withdrawal)

System) এর নির্দেশ আছে। সচেতনতার অভাব থেকেই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি মার খায় এতে ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অভিযুক্ত করার কারণ নেই। হিন্দুদের পূর্বপুরুষের বংশলতিকার দেখলে (এর মধ্যে বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারও পড়ে) লজ্জার পড়ে যাবেন।

প্রঃ মুসলমানরা চারটে করে বিয়ে করে আর ১৪/১৫ টা বাচ্চার জন্ম দেয়, তবুও এসব বলে যাবেন?

উঃ একাধিক বিবাহ করলে সব স্ত্রীর প্রতি সমান যত্নশীল হতে হবে এই ধর্মীয় নির্দেশ না মেনে যারা বহু বিবাহ করে তারা আর যাই হোক ইসলাম মানে না। এই কারণেই পৃথিবীর নয়টি দেশে (ইরান সহ) বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশের মতো ভারতের নারী পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৪৯ শতাংশ-৫১ শতাংশ। যদি বেশীর ভাগ মুসলমানরা বহু বিবাহে আগ্রহী হত তবে তাদের অন্তত বিবাহযোগ্য মুসলিম নারীর অভাবে হিন্দুদের আমহি হতে হত। ফলে যেসবো বৈশীরাভাগ হিন্দু যুবককে উপযুক্ত স্ত্রীর অভাবে অবিবাহিত বা চিরকুমার থেকে যেতে হত। বাস্তবে তা ঘটে নিখুঁত ফটার সম্ভাবনা কম। স্বাস্থ্যে এক সমস্ত আরব বুনিনার যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে পরাজিত শত্রু সম্পত্তি (মহিলাদেরও সম্পত্তি ধরা হত) জব্বীর ভোগ দখলে যেত। বহুবিবাহের চল সেই সময় থেকে। ইজরত মহম্মদ সেটা কমিয়ে ৪ এর বেশী না এবং বিভিন্ন শর্তাবলীর নির্দেশ দেন। একাধিক বিবাহে মুসলিম পরিবারের স্ত্রীগণের সমান মর্যাদা এবং অধিকার আইনী। বিখ্যাত রবিশংকর, উজ্জ্বল কুমার, ধর্মেন্দ্রের মতো 'উপপত্তী' নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় না।

প্রঃ এতগুলো মাংগার কথা বললেন যেখানে শুধু হিন্দুদেরই দেখা যেতেন। মুসলমানদের কেনও দেখা কি নেই?

উঃ আমি একবারও মাংগা শব্দটি উচ্চারণ করিনি। হিন্দু বও অভিযুক্ত করিনি। ৪৭ সালের পর সংখ্যালঘুদের উপর যতগুলি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তা রাষ্ট্রীয় নীতির বাস্তব প্রকাশ। এদেশের রাষ্ট্রপ্রাণ্যবাদী ভাবনার পরিচালিত।

৩৩

ফলে রাষ্ট্র দলিত বা সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চালাবে, খুন, ধর্ষন করবে, সর্বশাস্ত করবে, এতে অবাধ হবার কিছু নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্রাংশ এই মানবতাবিরোধী যুদ্ধে রাষ্ট্রের সহায়তা করে। বাকি অংশের নীরবতা এই স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দেয়। মুসলমানরা যতদিন যেটো কমপ্লেক্স থেকে বেরোতে না পারবে ততদিন তাদের এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই বসবাস করতে হবে।

প্রঃ ভারত পাকিস্তান মাচে পাকিস্তান জিতলে মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজারে বাজি পটকা ফটানো হয়। এটা কি সমর্থনযোগ্য?

উঃ আপনি ঐ পটকার আওয়াজ নিজে কিম্বা অন্যের মুখে শুনেছেন। আমি ঐ বাজি পটকা ফটানো নিয়ে মুসলিম মহল্লায় মারপিট ফলে থানা পুলিশের ঘটনাও জানি। সবদেশেই সংখ্যালঘুদের এই সমস্যা আছে। আমি দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানাই। ফুটবলার প্রশান্ত ব্যানার্জীর বাড়িতে ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মার্ক ফুটবল ফাইনালের ভারত বাংলাদেশ ম্যাচের ভিডিও দেখছি। ভারত ১-০ গোলে জিতেছে। ম্যাচের শেষে ভারতের পতাকা নিয়ে সুদীপ চ্যাটার্জী প্রশান্ত ব্যানার্জী মাঠের চার পাশে দৌড়ছে। স্টেডিয়ামের এক প্রান্তে ভারতের পতাকা হাতে আনন্দোচ্ছল এক দল দর্শককে দেখলাম। প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করলাম 'ওরা এতজন ভারত থেকে ঢাকা গেছে খেলা দেখতে? প্রশান্ত চলতি ভুল উত্তর - 'ওরা বাঙালী। তারপর ভুল শুধরে প্রশান্ত-র উত্তর 'ওরা বাংলাদেশের হিন্দু কিন্তু ইন্ডিয়ান সাপোর্টার। ভারতের জয়ে ওদের আনন্দ।'

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাঃ বাল্যকালে লর্ডসের মাঠে ইংল্যান্ড (তখন এম.সি.সি) বনাম ওয়েস্টইন্ডিজের ক্রিকেট ম্যাচ দেখছি। এক ডাকবুকা ক্যারাবিয়ান বোলারের দ্রুত বলে কেন ব্যাটম্যান মাথায় আঘাত পেলেন। লজ্জিত ক্যারাবিয়ান খেলোয়াড়রা কেনকে ঘিরে ধরলো। মাঠে চিকিৎসকও এলেন। দর্শকাসনে কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে দেখলাম পরমানে 'সিটি' বাজাতে আর নাচতে। এরা কি ওয়েস্টইন্ডিজ থেকে এসেছে? আমার এই প্রশ্নে উত্তরে পাশে বসা

লন্ডনবাসী আদ্বায়র উত্তর : ওরা বৃটিশ, ব্রাউন বৃটিশ, স্বৈরাশ্ব আখ্যাত পোলে ওদের আনন্দ।

প্রঃ মুসলিম সমাজে মেয়েদের অধিকার কম। সবসময়ে বোরখা পরিয়ে রাখা হয়।

উঃ আমার ঠাকুরদাস আমার মাকে বলতেন যে গৃহবধূদের বাড়ীর বাইরে গেলে মাথার ঘোমটা দিয়ে যেতে হয়। এতো বেশীদিন আগের ঘটনা নয়। ১৪০০ বছর আগে হজরত মহম্মদ মেয়েদের পোষাকে শালীনতা বজায় রাখতে বলেছিলেন, তখন এটা অস্বাভাবিক ছিল না। এখন মুসলমান সমাজে মেয়েদের পোষাক নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। কোনও ধর্মগ্রন্থ বা সরকারের নির্দেশে নয় মেয়েরা তাদের পোষাক নির্বাচনের দায় নিজেদেরই নিক বিদ্যাসাগর মহাশয় শত চেষ্টা করে বিধবা বিবাহের আইন পাশ করিয়েছিলেন, আজও হিন্দু পরিবারে বিধবা মানে বাড়ীর অঘোষিত সহায়িকা (চলতি কথায় ঝি) বা কাশী-বৃন্দাবন-মথুরার ভিখারিনী। মুসলিম সমাজে বিধবাদের পূর্ণবিবাহ এবং মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার বহু আগে আইনানুগ হয়েছে। সব সম্পদায়ের মেয়েদের মতো এই অধিকার আদায় করার আবেগজন দূর্বল।

প্রঃ আপনাকে তো নাস্তিক মনে হচ্ছে, আপনি কি ধর্মকে আফিম মনে করেন?

উঃ আমার মতে সব ধর্মই প্রতিষ্ঠানিক চেহারা নেওয়ার আগে আত্মের আর্তনাদ, অসহায়ের সহায়, পীড়িতের দীর্ঘনিঃশ্বাস। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মজুরের ঘাম মাটিতে পড়ার আগে মজুরী দিতে বলেছিলেন। খেতে বসার আগে কোনও প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় আছে কিনা খোঁজ নিতে বলেছেন। সেই ধর্ম আজ একদল অশিক্ষিত মোল্লা আর তেল ব্যবসায়ীদের টিকে থাকার হাতিয়ার। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে যে পৌতম বুদ্ধ অমানবতা আর ভগবান তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন তিনি আজ বিলাসী দলহিলামার হাতে বন্দী। যীশু খৃষ্টের দেহ থেকে বহমান রক্ত আজ ভ্যাটিকান সিটির পোপ পাসের ব্যাঘ

আক্যাউন্টে স্বর্ণমুদ্রা জমায়ে।

আজ এমন একটা সময় এসেছে যেখানে মানুষের একমাত্র পরিচয় সে কতটা মানবিক, কতটা বস্তুবাদী, কতটা আধুনিক। কোনও পার্থিব সমস্যার অপার্থিব সমাধানের খোঁজ করা মুখাম্মি।

মনুষ্কৃতির গর্ভজাত ব্রাহ্মণ্যবাদের জেলখানা থেকে হিন্দুধর্মকে মুক্ত করার চেষ্টা শতবার করলেও আজ তা অসম্ভব। ভারতে ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে আধুনিক রূপের নাম ব্রাহ্মণ্যবাদ।

চেতনা লহরের বর্তমান সম্পাদক ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে কোচবিহারের এক শিক্ষক সম্মেলনে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার পরে উপরোক্ত প্রশ্ন উত্তরের পালা।



**DAFODWAM (DEMOCRATIC ACTION
FORUM OF DALITS, WOMEN AND
MINORITIES)**

প্রকাশিত

**CLASS CASTE RELATIONS MARXIST
APPROACH** সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান : ওয়ার্ল্ড ডিউ (বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), বুক মার্ক,
পাতিরাম, নিউ হোরাইজন বুক ট্রাস্ট, পাভলব ইনস্টিটিউট,
রাসবিহারী মোড় এবং টেলিফোন ভবনের কাছে বইয়ের দোকান।

যোগাযোগ : দূরভাষ - ৯৩৩১৮৫৮৮৫৩

Email : dafodwam@gmail.com

পুস্তক পর্যালোচনা

সুনীল রায়

জলদিন্দু মিশ্র রচিত
রত্নগিরির মহাবল্লভ

ভারতের “ স্বাধীনতা” লাভের প্রেক্ষাপটে রচিত অগণিত গ্রন্থরাজির মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখ্যযোগ্য সংযোজন। উপরনৈতিক মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থকার এখানে যথেষ্ট সংখ্যক তথ্যের সমাবেশের মাধ্যমে গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনদাস গান্ধী, নেহরু, মোহাম্মদ আলি জিন্না, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতাদের মানবতাবিরোধী ধর্মাত্মতা এবং মণ্টাচারিতাকে প্রাজ্ঞলভাবে তুলে ধরেছেন এবং তিনি ডঃ ভীমরাও রামজী আশ্বেদকরের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী চরিত্রটিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বটে তবে তাঁর জীবনসংগ্রামের মারাত্মক ব্যর্থতাগুলিকে তার সঙ্গে অঙ্গীভূত করে তুলতে পারেন নি। তার ফলে ডঃ ভীমরাও রামজীর ব্রাহ্মণ্যতত্ত্ববিরোধী সংগ্রামে এবং দলিতজাতি সমূহের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্র এই সকল অনভিপ্রেত ঘটনাও দেখতে পাই :

- (১) সারাজীবন ব্রাহ্মণউপাধি ধারণ।
- (২) হিন্দু মন্দিরাদিতে বারে বারে প্রবেশের অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা।
- (৩) সাইমন কমিশনে দলিতজাতিগুলির অন্যান্য প্রতিনিধিদের বিপরীত অবস্থানে গিয়ে তাঁর সংরক্ষিত আসনসহ যৌথ নির্বাচনের দাবী পেশ।
- (৪) দ্বিতীয় গোল টেবিলে বৈঠকে হিন্দুপ্রতিনিধি শ্রী মোহনদাস গান্ধীর অবিভাজ্য ভারতের দাবী নস্যাৎ হয়ে যখন দলিতজাতিগুলির, মুসলমানদের ও

অদলিত হিন্দুদের জনসংখ্যার অনুপাতে তিনটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বত্বসফল হওয়ার পথ সুগম হচ্ছিল ঠিক তখনই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডকে অখণ্ড ভারতের জন্য সুপারিশের মাধ্যমে কার্যত দলিতরাষ্ট্রের দাবীত্যাগ, (পৃ: ২৫৭)

(৫) মোহনলাস গান্ধীর ন্যায় একজন দলিতবিরোধী গোড়া ব্রাহ্মণাতন্ত্রীয় (পৃ: ২৪৬-৬৪) দুনিয়ার উপন্যাসে উতলা হয়ে পুণ্যচুক্তির নামে দলিত মুক্তি বিসর্জন।

(৬) আদিবাসীদের স্বার্থ বিষয়ে অনীহা।

(৭) ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে রাহির অধ্যক্ষের মোহনলাস গান্ধী মুসলিম প্রতিনিধিদের যে গোপনে সাক্ষাৎ করে বাংলা ও পাঞ্জাবকে তাঁদের উপহার দেওয়ার 'অঙ্গীকার' করেছিলেন তা জানা সত্ত্বেও ভীমরাও রামজীর নির্বিকারত্ব।

(৮) কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লির নির্বাচনে মহারাষ্ট্র থেকে পরাজিত হওয়ার পর বাংলার নমোজাতি তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধির স্থানে তাঁকে নির্বাচিত করা সত্ত্বেও স্বাধীনতায় তাঁদের বাসভূমি পাকিস্তানকে অর্পণে এবং 'খাখীনাওর' কালে উদ্ধার রূপে তাদের নির্মূলকরণের প্রাক্কণ্য প্রচেষ্টায় তাঁর উদাসীনতা।

(৯) অরণ্যবাসীদের সৃষ্ট পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের সাংবিধানিক সুরক্ষা স্বতিরেকে অরণ্যের অধিকার কার্যত হরণে সংবিধানের মুখ্য-রচয়িতা রূপে তাঁর ভূমিকা।

(১০) জীবনসাম্রাজ্যে হতাশার বাশে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে ভাববাদী মতাদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্যর বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি, ইত্যাদি আশোচ্য গ্রন্থে হয় অবাক নয়তো অবাকাত থেকে গেছে।

ধর্মীয় ও সামাজিক সামাজিক আন্দোলন-ইউরোপীয় গুণিতকীয় শিল্পের প্রভাবে মোহনলাস ভীমরাও রামজী স্মরণীয় দৃশ্য-যুগের সম্পর্কে আবেগ

ভারতীয় সমাজের আত্মীয়তাবাদের মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং সেই জন্যই ভারতীয় সংগ্রামী দলিতজাতিসমূহের বাস্তববাদী নেতৃত্বে তিনি নিজেকে উদ্বীত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর সেই ব্যর্থতাই তাঁকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অলীক স্বপ্নে বিভোর করে রেখেছিলো, দলিত মুক্তিকে উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্তর থেকে দূর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে হতাশায় ভরে তুলেছিলেন। গ্রন্থকার উপরনৈতিক দৃষ্টিতে ভীমরাও রামজীর মধ্যে 'মহারাজের' অনুসন্ধান প্রয়াসী হয়ে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি যে ঐ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁকে সামগ্রিক সত্যায় উপস্থাপিত করা যায় না।

এই গ্রন্থের বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে অজ্ঞত উদ্ভৃতি এবং সেগুলি বস্তুব্য বিষয়ের সত্যতা প্রমাণের অল্পরূপে ব্যবহৃত হয়েছে বলে তাদের উৎসের অনুরোধে সেগুলি আদৌ অস্ত্র হয়ে ওঠেনি।

গ্রন্থখানির তথ্যগত অনেক ত্রুটির মধ্যে বাংলার বলিষ্ঠ দলিত আন্দোলনের এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্ব হারানো ভীমরাও রামজীকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে তুলে ধরার ক্ষেত্রে নমোজাতির অবদানের অনুপ্রেরণকে বিশেষভাবে নির্দেশ করতেই হয়।

(ইনকি লাবী) যুদ্ধ এক এক সময় এক এক ভাবে
চলতে থাকে। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও অত্যন্ত
গোপনে। কখনও শান্তিপূর্ণভাবে, কখনও বা
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে।

- ভগৎ সিং



ব্রাহ্মণ্যবাদী শান্তি, দলিত কিশোরের গোমূত্রে স্নান - রাজস্থান ২০০৭

নমশূদ্র নয়, নমো

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে তথা হিন্দুধর্মে (১) মানুষের থাকে পেশাগত জাত পরিচয়, পেশাটা হলো জাত-পেশা। আর তাই ব্রাহ্মণ বা বামুনের পেশা শিক্ষা ও পুরোহিতগিরি, কায়স্থর পেশা কেরানীগিরি, বৈদ্যের পেশা চিকিৎসা, জেলের পেশা মৎস্যশিকার ইত্যাদি। যদিও চাষাবাদ কোন জাতের পেশা, তা সুস্পষ্ট নয়, (কেননা, পুরাণ কাহিনীতে এ পেশার ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ উভয়কে বৈশ্যের পাশে দেখা যাচ্ছে।) তাই এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ পেশাভিত্তিক কোন জাত পরিচয় কোন হিন্দু জাতের নেই। আবার বাংলায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত সবাই শূদ্র। সেফেয়ে নমোদের নামের সঙ্গে বিশেষ করে 'শূদ্র' বোঝ করা হলো কেন? কেন বলা হয় না কায়স্থশূদ্র বা কৈবর্ত বা মাহিষাশূদ্র? এ প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই একটা সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করতেই হয় এবং প্রশ্নটি হলঃ নমো বা নমোশূদ্র আদৌ কি কোন জাত? প্রশ্নটা আসে এই জন্য, যে জাত হলেই তার থাকার কথা একটা জাত-পেশা। নমোদের বিশেষ কি কোন জাত-পেশা আছে? বা কোন দিনই কি ছিল? নমশূদ্রকে হিন্দু জাতের সম্প্রদায় বলতে হলে জানা চাই, তাদের জাত-পেশা কি? কেননা, সকলেই জানেন, জীবনধারণের জন্য এমন কোন পেশা নেই, যা নমোরা করেন না। তারা চাষাবাদ করতেন, মাছ ধরতেন, ছুতোর নিষ্ক্রি বা রাজমিস্ত্রির কাজও করতেন, এমনকি করতেন শিক্ষকতার কাজও, এবং আজও তারা এসব পেশার সঙ্গে যুক্ত। তেমন ক্ষেত্রে এদের হিন্দু করতে হলে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অধীন আনতে হলে কোন পেশা-ভিত্তিক জাত পরিচয় দেওয়া যায় কী ভাবে? অথচ দায়ে পড়ে যখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা বিশাল নমোজাতিতে হিন্দু করতে চাইলেন, তখন তাদের পক্ষে এমন দাবি করা সম্ভব ছিল না, যে নমোদের কোন একটা বিশেষ পেশা বেছে নিতে হবে। আবার নমো কোন পেশাগত নামও নয়, যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে তারা কেবল নমো নামে অভিহিত হবেন। এই নাম নিয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এলে নমো জাতির স্বাতন্ত্র্য টিকে থাকে বা ব্রাহ্মণের স্বাতন্ত্র্যকে মুখোমুখি আনান (অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ করে)। এজন্যই ব্রাহ্মণদের দাবি ছিল নমো নামের সঙ্গে শূদ্র বোঝ করে তাদের হিন্দু করা, অপরদিকে নমোদের দাবি

ছিল তারা শুধুই নমো। তা হলে কীভাবে নমোরা হলেন নমশূত্র?

ইসলামে ধর্মোত্তরিত হওয়ার প্রবণতা ঠেকানো নমো নেতাদের নিকট অত্যন্ত জরুরি ছিল। কেননা নমোদের থেকে সেন আনলে যারা হিন্দু হয়েছিলেন, তারা নমোদের জীবনাদর্শ তথা সংস্কৃতি নিয়েই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে আশ্রয় পান। অপরদিকে ইসলামে আশ্রয় নিলে নমো সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হয়। এদিক দিয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নমোদের নিকট কিছুটা কাছাকাছি ছিল, বিশেষ করে এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র অতিরিক্ত কোন ধর্মীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয় না।

এমতাবস্থায় নমো নেতারা তাদের নামের সঙ্গে শূত্র যোগ করে হিন্দু হলেন এবং নিজেদের নমোজাতিগত কর্মসংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারলেন।

এটা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উপর আঘাত হিসাবে বিবেচনা করা যায় এজন্য যে নমোরা হিন্দু হয়েও সকল প্রকার কাজ করার অধিকার ধরে রাখলেন যদিও ইতিপূর্বেই ইংরেজ আগমনের ফলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ভাঙতে শুরু করেছিল। অপরদিকে নমোদের এই 'আখা হিন্দু' হওয়া তাদেরও এক প্রকার পরাজয়, যে তাদের কোন পেশাগত হিন্দু জাত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তাদের 'জাতি' নমোর সঙ্গে শূত্র যোগ করলেন। এখানে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরও পরাজয়। কেননা, বর্ণব্যবস্থা বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তাদের নমোদের জন্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চতুর্থ বর্ণের নাম পরিচয় স্বীকার করতে হলো। আবার ব্রাহ্মণ্য জাত পরিচয়ের যে পেশাগত ভিত্তি তা না থাকায় নমোরাও পুরোপুরি হিন্দু নন, 'আখা হিন্দু'। নমোদের পক্ষে এটা এক অবমাননা, যে তারা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু না হয়েও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে শূত্রজাত পরিচয় তাদের বহন করতে হচ্ছে। নমো 'জাতি' তারা হয়েছেন নমশূত্র 'জাত'। অবশ্য এই আত্মবিশ্বাসনা হিন্দুর সংজ্ঞার লোকদের ক্ষেত্রেই সত্য। কেন?

অন্যজাতের হিন্দুরাও সাধারণভাবে ব্যক্তিগতভাবে যে পেশায় যুক্ত তার সঙ্গে তার হিন্দু জাত পরিচয়ের কোন মিল নেই। অন্য ধর্মের লোকদের পেশাগত জাত পরিচয় নেই বলে তাদের দৈত পরিচয় বহন করতে হয় না। কিন্তু একজন

হিন্দুকে প্রায়শঃ দৈত পরিচয় বহন করতে হয়, এবং আশ্চর্য এই, যে তাতে তাদের আত্মসম্মান আহত হয় না। এমন কি, ইংরেজ আগমনের পর থেকেই যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে অস্বীকার করে এদেশের মানুষ জাত-পেশা বহির্ভূত পেশা গ্রহণ করে চলেছেন, তাতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধারক-বাহক নির্দেশক স্বয়ং ব্রাহ্মণ্যেরও মনে হয়নি, যে তারা নিজেরাই তাদের ধর্ম-বিরোধী কাজ করে চলেছেন এবং তারপরও তারা হিন্দু থেকে যাচ্ছেন। ধর্মের ব্যাপারে স্পর্শকাতর জানী ব্রাহ্মণ্যের এই দৃষ্টি খর্বতার কারণ কী? তা হলে কি তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বা হিন্দুধর্ম কোন ধর্মই নয়?

অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য মানুষ পেশা পরিবর্তন করে এবং নিজেদের যোগ্যতানুযায়ী যে-কোন উপযুক্ত পেশা গ্রহণ করতে পারেন। একদা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র পেশা পরিবর্তন করতে দিত না ধর্মের মোহাই দিয়ে। ব্রিটিশ পুঁজি এদেশে আসার পর টোল চতুষ্পাঠী বা পুরুতগিরি অলাভজনক ব্যবসা হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। ব্রাহ্মণ্যেরা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে 'ব্যবসার' অধীন চাকুরি নিতে শুরু করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয়, যে তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্ম আদৌ কোন ধর্মই নয়, তা ছিল ব্রাহ্মণ্যের স্বার্থবাহী এক ধরনের অর্থনীতি।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নমোদের হিন্দু হিসাবে গ্রহণ করলেও নমোরা তাদের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়া ধরে রেখেছেন। যে কেউ তার পছন্দের কাজ করতে পারেন, এমন কি ব্রাহ্মণ্যের পুরুতগিরি পর্যন্ত। অর্থাৎ নমো বা হিন্দু হয়ে নমশূত্র হলেও তারা ব্যবহারিক জীবনে নমোই রয়ে গেছেন। কেবল তাদের বস্তববাদী জীবনদর্শনের উপর ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণবীয় ভাববাদের সামান্য প্রভাব পড়েছে মাত্র।

ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতের (১) একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ অথবা বস্তববাদী জীবনাদর্শের নমোজাতি গোষ্ঠীর পক্ষে তাদের আধুনিক সমাজনেতা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের উত্তরগুরু রূপে নিজেদের মূল জাতি (people) জাত (caste) নয়, জাতি (people) পরিচয় অর্থাৎ নমো জাতি পরিচয় পুনরুদ্ধারের

আন্দোলন শুরু করার সময় হয়েছে। মনে রাখতে হবে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কেবলমাত্র নমোদেরই আছে নমোজ্জাতি পরিচয়ের ইতিহাস। অন্যদের প্রশ্ন করুন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে যারা সেন আমলে নানা হিন্দু জাত পরিচয় 'জয়' করেছিলেন, তাদের জনগোষ্ঠীগত ঐতিহাসিক পরিচয়টা কী? উত্তর পাবেন পুরাণের নান গাঁজাবুরি গল্প। কিন্তু তারা তো আকাশ থেকে পড়েন নি, যে তাদের ঐতিহাসিক পরিচয়ের অন্য পৌরাণিক গল্প বানাতে হবে? তা হলে নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস উদ্ধারে বাধা কোথায়? বাধা কি উঁচু-নীচ জাত তত্ত্বের হীনমন্যতা ও উৎকর্ষমন্যতা? তাই কি এদেশে ঐতিহাসিক সত্য প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যে অনুপস্থিত থাকে? একেবারে শিশু কিশোর অবস্থ মানবের ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হতে বাধা কোথায়? গণতন্ত্রের ভিত্তি যেখানে সুখম সমাজ, সামাজিক বৈষম্যহীনতা, সেখানে রাষ্ট্রই বা কেন ইতিহাসের পাঠ্যে মানবের ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশে উদাসীন? শানক-শোফকদের ভয় কি তবে মানুষ-মানুষে সামাজিক বৈষম্যহীনতা, তার সামাজিক ঐক্য?

(বিকল্প বার্তা - পত্রিকা দ্বারা প্রকাশিত প্রচারপত্র চেতনা লহর পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে সুস্থ বিতর্ক তোলার আশায় মুদ্রিত হোল)